উপন্যাস

ধূসর সময়

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM 2021

সূচিপত্র

১. রাতের খাওয়ার টেবিলে 2
২. ঘুম কমে যাচ্ছে 14
৩. নার্সিং হোমটার মালিক 27
৪. আজ রিলিভড 35
৫. ভিজিটিং আওয়ার্স 47

১. রাতের খাওয়ার টেবিলে

এ-বাড়িতে রাতের খাওয়ার টেবিলের জমায়েতটাই সবচেয়ে উপভোগ্য ব্যাপার। বিশ্বদেব এবং তার স্ত্রী, তাদের দুই ছেলে নভোজিৎ এবং চন্দ্রজিৎ, এক বউমা শর্মিলা, এক মেয়ে স্বস্তি, সবাই জড়ো হয় এ সময়ে। টেবিলটা এত বড়ো নয় বলে সবাই একসঙ্গে খেতে বসে না। দুই ছেলেকে নিয়ে বিশ্বদেব বসে, আর কখনো কখনো ছেলেদের চাপাচাপিতে তাদের মা-ও। শর্মিলা আর স্বস্তি প্রায়ই দেরিতে একসঙ্গে খায়। দু-জনে খুব ভাব। আপাতত তারা পরিবেশন তদারকি করছে। প্রকাশ তেওয়ারি এ-বাড়ির রান্নার লোক, ফর্সা, মধ্যবয়সী সুদর্শন পুরুষ। সে বিশ্বদেবের অফিসেও হেড বেয়ারার চাকরি করে। এ-বাড়িতে রান্নার বিনিময়ে সে মাসে হাজার টাকা, খোরাক এবং গ্যারেজের ওপরে মেজেনাইন ফ্লোরে থাকার জায়গা পেয়েছে। বিশ্বদেবের বড় মেয়ে শ্রাবন্তীর বিয়ে হয়ে গেছে। সে দিল্লিতে থাকে। নভোজিৎ অত্যন্ত কৃতবিদ্য ডাক্তার। সে এফ.আর.সি.এস. এবং এই শহরে তার জন্যই বিশ্বদেব একটা বড়ো এবং অত্যাধুনিক নার্সিং হোম খুলেছে। এত ভালো নার্সিং হোম আশেপাশে কোনো শহরেই নেই। চন্দ্রজিৎও ডাক্তার, সবে পাশ করে এখন কলকাতা মেডিকেল কলেজে ইন্টার্ন। টার্ম শেষ হলে বিদেশে যাওয়ার প্ল্যান আঁটছে। সে কয়েকদিনের ছুটিতে এসেছে।

বিশ্বদেবের অবস্থা ভালো, মূলত কন্ট্রাক্টরির কারবার ছিল, সিভিল কনস্ট্রাকশন থেকে সে কাঠের ব্যবসা শুরু করে। তারপরে একটি টিকপ্লাই তৈরির কারখানাও। সে এই মফস্সল শহরের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান।

রোজই রাতের এই খাওয়ার টেবিলে একটি গরম আড্ডা হয়।

বিশ্বদেব খেতে খেতে হঠাৎ বলল, টুলু, আজ তোকে একটু অফ-মুড বলে মনে হচ্ছে কেন রে?

টুলু নভোজিতের ডাকনাম। সে একটু হেসে বলল, প্রফেশনাল হ্যাজার্ড।

তার মানে? কোথাও সিরিয়াস রুগি নাকি?

একরকম তাই। তবে রোগ নয়, একটা মেয়ে বিষ খেয়েছে। পাম্প করে বের করা হয়েছে বটে, কিন্তু খানিকটা রক্তে মিশে গেছে। কোমাটিক কণ্ডিশন।

বয়স কত?

উনিশ-কুড়ি।

লাভ অ্যাফেয়ার, নাকি ডাওরি ফল আউট।

মেয়েটা কুমারী।

ব্যর্থ প্রেম, পরীক্ষায় ফেল বা ডিপ্রেশন।

না, তাও নয়। মেয়েটাকে তুমি হয়তো চিনবে।

কে বল তো।

হেডমিস্ট্রেস মৃন্ময়ী ভট্টাচার্যের মেয়ে রাখী।

বিশ্বদেব থমকে কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থেকে বলল, রাখী?

হ্যাঁ, স্পিরিডেট মেয়ে। ভালো গান গায়, চমৎকার ডিবেটার। তার ওপর ভালো ছাত্রী। দেখতেও খারাপ নয়। আজ সন্ধ্যেবেলা নার্সিং হোমে ভরতি করা হয়েছে। জ্ঞান নেই।

বিশ্বদেব স্থিরদৃষ্টিতে ছেলের দিকে চেয়ে ছিল। খুব আস্তে করে জিজ্ঞেস করল, অবস্থা কেমন? বাঁচবে?

বোঝা যাচ্ছে না। রাতের দিকে ডায়ালিসিস করা হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমাকে রাতে যেতে হতে পারে।

আগে ডায়ালিসিস করা হল না কেন?

ডাক্তার বৈদ্য আর সেনশর্মা দেখছেন। অ্যান্টিডোট পুশ করা হয়েছে। রি-অ্যাক্ট করলে খুব একটা ভয় নেই। টকসিনটাও ডিটেকটেড হয়েছে।

কিন্তু সেটা বড়ো কথা নয়। মৃন্ময়ী দিদিমণি বলেছেন, অ্যাটেমপটেড মার্ডার।

বিশ্বদেব অবাক হয়ে প্রতিধ্বনি করল, মার্ডার।

বিশ্বদেবের স্ত্রী রুচিরা মন দিয়ে শুনছিল, এবার বলল, রাখীকে খুন করতে চাইবে কে? একটু ঠোঁটকাটা আর দেমাগি আছে বটে, কিন্তু এমনিতে তো ভীষণ ভালো মেয়ে।

স্বস্তি চুপ করে ছিল। হঠাৎ বলল, আমি কিন্তু জানতাম।

রুচিরা বলল, কী জানতিস?

রাখীর এরকম একটা কিছু হবে।

কী করে জানলি?

চকোলেট ক্লাবের হাবুকে তো ও-ই ধরিয়ে দিয়েছিল। ওর ভীষণ সাহস। গতবার পুজোর ফাংশানে অষ্টবসু নামে যে বাংলা ব্যাণ্ডটা গাইতে এসেছিল তাদের তিনজন মাতাল অবস্থায় স্টেজে উঠেছিল বলে ওই তো প্রথম দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি শুরু করে। তারপর কী গন্ডগোল! পুজো কমিটি পারলে রাখীকে খুন করে ফেলত।

শর্মিলা বলল, কাল যাব তো মেয়েটাকে দেখতে নার্সিং হোমে। শুনেই মনে হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং মেয়ে।

চন্দ্রজিৎ ওরফে বাবলু একটু কম কথার মানুষ। এতক্ষণ এই প্রসঙ্গে একটাও কথা বলেনি। শর্মিলা তার দিকে চেয়ে হঠাৎ বলল, আচ্ছা বাবলু এত চুপচাপ কেন আজকে? এই বাবলু, কী হয়েছে তোমার?

বাবলু মুখ তুলে একটু হাসল, বলল, কিছু না।

শরীর ঠিক আছে তো?

আরে হ্যাঁ, সব ঠিক আছে।

বাবলু উঠে বেসিনে হাত ধুতে গেল।

রুচিরা হঠাৎ চাপা গলায় বলল, ও-ই তো মাথাটা খেয়েছে।

বিশ্বদেব একটু অবাক হয়ে স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলল, কে কার মাথা খেয়েছে?

সে আর তোমার শুনে কাজ নেই।

নভোজিৎ তার বাবার দিকে চেয়ে বলল, এ-ব্যাপারে পুলিশ কিন্তু খুব ক্যালাস। তেমন একটা ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছে না। শিবদাসবাবুকে তোমার কেমন পুলিশ অফিসার বলে মনে হয়?

কেন, শিবদাস তো বেশ এফিসিয়েন্ট..

রাখীর ব্যাপারে কিন্তু তেমন কোথাও খোঁজখবর করল না। আমাকে শুধু জিজ্ঞেস করল, পয়জনিংয়ের কেস নার্সিং হোমে ভরতি করলেন কেন? হাসপাতালে পাঠানোই তো উচিত ছিল। আর জিজ্ঞেস করল, সুইসাইড নোট পাওয়া গেছে কিনা।

সুইসাইড নোট পাওয়া গেছে?

তা জানি না। রাখীকে তো পাওয়া গেছে ওদের বাড়ির চিলেকোঠায়। সুইসাইড নোট থাকলে সেখানেই থাকবে। ওকে যখন নার্সিং হোমে আনা হয় তখন পরনে একটা হাউসকোট ছিল। তার পকেটে কিছু পাওয়া যায়নি।

বাড়িতে তখন কেউ ছিল না?

না, মৃন্ময়ী ভট্টাচার্য তো ডিভোর্সি। মা আর মেয়ে থাকে। কাজের ঠিকে ঝি বিকেলে কাজটাজ করে চলে যাওয়ার পর রাখী একাই ছিল। ওর মা সন্ধ্যের সময় ফিরে কলিং বেল বাজিয়ে সাড়া পাননি। অথচ মাত্র মিনিট পনেরো কী কুড়ি আগেই নাকি মেয়ের সঙ্গে ফোনে ওঁর কথা হয়েছে। উনি জোর দিয়ে বলছেন, কথা বলার সময় উনি টের পেয়েছেন যে রাখীর সঙ্গে কেউ একজন আছে।

কে ছিল?

সেটা বলতে পারছেন না? ওঁর দৃঢ় বিশ্বাস এটা খুনের চেষ্টা।

তোরা, ডাক্তাররা কী বলিস?

সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রাখীর মাথার পেছন দিকে একটা জায়গা ফুলে কালসিটে পড়েছে। ইনজুরি মারাত্মক নয়; তবে এমন হওয়া বিচিত্র নয় যে, কেউ মাথার পেছন দিকে শক্ত কিছু দিয়ে মেরেছিল। আবার বিষ খাওয়ার পর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়ে থাকলেও ওরকম ইনজুরি হতে পারে।

অজ্ঞান হয়ে গেলে বিষ খাওয়ানো হল কেমন করে?

মুখে ঢেলে দিলেও হতে পারে। শিবদাসবাবু অবশ্য এসব জানতে চাইছেন না। তিনি সুইসাইড বলে হাত ধুয়ে ফেলতে চান। মেয়েটা বেঁচে উঠলে অবশ্য অন্য কথা।

শিবদাসকে মাথার চোটের কথা জানিয়েছিস?

হ্যাঁ, উনি পড়ে যাওয়ার থিয়োরিতে বিশ্বাসী। তুমি কি জানো মৃন্ময়ীর হাজব্যাণ্ড রমেন ভট্টাচার্য কোথায় আছে?

না, কলকাতায় তো ছিল।

বাবলু তার ঘরে আলো নিবিয়ে চুপ করে জানালার ধারে বসে ছিল। জানালাটা উত্তরে। খোলা জানালা দিয়ে প্রচন্ড ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে হুড়হুড় করে।

দরজায় টোকা দিয়ে বউদি চাপাস্বরে ডাকল, এই বাবলু!

বাবলু জানে, বউদি সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়। বউদি মেয়েটা বড্ড ভালো। বোকা নয়, অতি চালাক নয়, স্বার্থপর নয়, মিশুকে এবং স্বভাবটি ভালো। এই জন্যেই বউদির সঙ্গে তার একটা ভারি মিষ্টি বন্ধুত্ব হয়েছে। সে উঠে নিঃশব্দে দরজাটা খুলে দিল।

জ্বালাতে এসেছ তো?

মোটেই নয়। খবরটা নিশ্চয়ই তুমি জানতে?

হ্যাঁ।

কখন জানলে?

সন্ধ্যেবেলাতেই। ওদের বাড়ির দিকেই যাচ্ছিলাম।

কী সাহস! মৃন্ময়ী দিদিমণি তোমাকে আগের বার অত অপমান করার পরও? বাড়ি না গিয়ে বাইরেই তো দেখা করতে পারতে!

চেষ্টা করেছিলাম। রাখী কাল থেকেই ফোনে কাটাকাটা কথা বলছে। দেখা করতে চাইছে না।

ওমা! কেন? হঠাৎ ওর হল কী?

সেটা জানবার জন্যেই তো আজ মরিয়া হয়ে যাচ্ছিলাম। তখন ছ-টা বেজে গেছে। দিদিমণি সাধারণত আরও একটু দেরিতে ফেরেন। আজ গিয়ে দেখলাম, বাড়িতে চেঁচামেচি, লোক জড়ো হয়েছে।

নার্সিং হোমে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ, গা-ঢাকা দিয়ে।

হঠাৎ সুইসাইড করতে গেল কেন?

করেনি। করার চেষ্টা করেছিল। নার্সিং হোমের পিউ মজুমদারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলল, বেঁচে যাওয়ার চান্স আছে।

তোমার সঙ্গে কিছু হয়নি তো?

না বউদি।

তোমাদের মধ্যে কমিউনিকেশন আছে তো।

ছিল। দিনসাতেক আগে অবধি ফোনে রেগুলার কথা হত। দিনে অন্তত চার-পাঁচটা এস এম এস পেতাম। কিন্তু সাতদিন আগে হঠাৎ একদিন কমিউনিকেশনটা কেটে গেল।

কে কাটল? রাখী?

হ্যাঁ। ফোন করলে খুব আলতো দু-একটা কথা বলে লাইন কেটে দিত। নিজে ফোন করত না, এস এম এসও বন্ধ।

খুব স্ট্রেঞ্জ তো। একটা কারণ তো থাকবে।

সেটাই বুঝতে পারছি না। আমার হঠাৎ এখানে আসার কারণও সেটাই। আমি জানতে চেয়েছিলাম হঠাৎ কী এমন হল, কিন্তু ও তো দু-দিন ধরে দেখাই করতে চাইছে না। তার ওপর আজ এই কান্ড।

ওর বন্ধুদের কাছে খোঁজ নিয়েছিলে? তেমন কিছু প্রবলেম হয়ে থাকলে তো বন্ধুদের কাছে বলবে।

ওর সবচেয়ে কাছের বন্ধু নন্দিনী। কাল তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বলল, রাখী কোনো কারণে আমাকে কাটিয়ে দিতে চাইছে। কিন্তু কারণটা বলেনি। চাপা স্বভাবের মেয়ে, জানোই তো।

দাঁড়াও, আমি বরং কাল থেকে একটু গোয়েন্দাগিরি শুরু করি।

না বউদি, ব্যাপারটা চাউর হোক আমি চাই না, রাখী নিজেই হয়তো কোনোদিন বলবে। তুমি খোঁজখবর করতে গেলে মা যদি জানতে পারে, তবে খুশি হবে না।

জানি। মা রাখীকে হয়তো ততটা অপছন্দ করেন না, কিন্তু রাখীর মাকে করেন। তাঁর ধারণা রাখীর বাবার সঙ্গে ওঁর ডিভোর্সটা ওঁর দোষেই হয়েছে।

কোনো অজ্ঞাত কারণে মৃন্ময়ী দিদিমণিও মাকে পছন্দ করেন না।

সেটাও জানি। এখন তবে কী করবে?

কী করব বলো তো। আমার তো কিছুই মাথায় আসছে না। তুমি নিজে তো একজন মেয়ে। বলো তো, একটা মেয়ে তার ভালোবাসার ছেলেটিকে হঠাৎ অপছন্দ করতে শুরু করবে কেন? যতদূর জানি, আমি তো কোনো দোষও করিনি।

মেয়েদের ভালোবাসা বেশ স্ট্রং হয় মশাই। ছেলেদের মতো তারা অত ছুঁকছুঁক করে বেড়ায় না। আর রাখী বেশ সিরিয়াস টাইপের মেয়ে।

এমনকী হতে পারে যে, হঠাৎ অন্য কারো প্রেমে পড়েছে?

দূর। ওসব নয়। বললাম তো, মেয়েরা অত সহজে পুরুষ বদল করতে পারে না। খুব স্ট্রং কারণ থাকলে অন্য কথা।

রাখীর ব্যাপারে আমার তো সে-রকমই কনফিডেন্স ছিল।

বিশ্বাসটা ভেঙে ফেলো না। আমাকে একটু ভাবতে দাও।

ভাবো। কিন্তু গোয়েন্দাগিরি করতে যেও না।

আচ্ছা ধরো, রাখী যদি তোমার ওপর ইন্টারেস্ট হারিয়েই ফেলে থাকে, তাহলে তুমি কী করবে?

তা জানি না, শুধু জানি আমি ওকে ভালোবাসি। মনে মনে একটা রচনা তো হয়ে আছে। কিন্তু যদি বুঝি যে, ও আমাকে আর সত্যিই চায় না, তাহলে পাগলও হব না, সুইসাইডও করব না। কষ্ট তো হবেই। খুব কষ্ট হবে।

তা তো হওয়ারই কথা, দাদা কী বলল শুনেছ তো? মৃন্ময়ী সন্দেহ করছেন অ্যাটেম্পটেড মার্ডার।

শুনলাম।

ভয় হচ্ছে, উনি আবার তোমাকে ফাঁসাতে চাইছেন না তো।

সেইজন্যেই রাখীর বেঁচে ওঠা দরকার। কিন্তু আমাকেই বা সন্দেহ করবেন কেন উনি? আমি তো রাখীকে ভালোই বাসি। খুনের প্রশ্ন উঠবে কেন?

মৃন্ময়ী ফ্রাস্ট্রেটেড মহিলা। ওঁদের মন সোজা পথে হাঁটে না।

রমেন ভট্টাচার্যকে তো তুমি দেখোনি বউদি।

না, ওঁদের ডিভোর্স হয় বোধহয় বারো-চোদ্দো বছর আগে। তবে শুনেছি, রমেন ভট্টাচার্য ভালো লোক ছিলেন।

হ্যাঁ, নিরীহ শান্ত মানুষ। পি.ডব্লু.ডি.-তে কাজ করতেন। খুব উঁচুদরের চাকরি নয়। লো প্রোফাইল ছিলেন। মৃন্ময়ী বরাবর ওঁকে ডমিনেট করতেন, শোনা যায় স্বামীকে মারধরও করেছেন। রাখী তখন খুব ছোটো। কিন্তু ওরও সেইসব অশান্তির কথা মনে আছে। ডিভোর্সের মামলা হওয়ার পর ভদ্রলোক একতরফা দাবি-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে চাকরিতে রিজাইন দিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

মৃন্ময়ী কি খুব খারাপ স্বভাবের মহিলা বাবলু? শুনতে পাই, উনি প্রচুর সোশ্যাল ওয়ার্ক করেন, দানধ্যানও আছে, ভালো গাইতে পারেন।

সেটাই তো মুশকিল হয়েছে বউদি, ওকে খলচরিত্রও বলা যাবে না। এ-শহরে ওর মানমর্যাদা কিছু কম নয়। সকলেই মৃন্ময়ীকে শ্রদ্ধার চোখেই দেখেন। স্কুলটাকে প্রায় একার হাতেই এতটা বড়ো করে তুলেছেন।

সে তো জানি, কিন্তু মৃন্ময়ী দিদিমণি তোমাকে কেন অপছন্দ করেন সেটাই বুঝতে পারছি না। তুমি অত্যন্ত ব্রাইট ছেলে, বলতে নেই দারুণ হ্যাণ্ডসাম, স্মার্ট, ডাক্তার, পাত্রীর বাজারে এরকম ছেলে তো পড়তে পায় না। তাহলে মৃন্ময়ীর তোমাকে অপছন্দ কেন?

চন্দ্রজিৎ ওরফে বাবলু ম্লান হেসে বলল, উনি হয়তো মেয়ের জন্য আরও প্রসপেকটিভ পাত্র আশা করে বসে আছেন।

বাজে বোকো না। রাখীই-বা এমন কী মেয়ে? মোটামুটি সুন্দরী বলা যায়। গুণও আছে। তা বলে হুরিপরি তো নয়, সাধারণ ঘরের আটপৌরে মেয়ে।

ঠিক তাই।

তোমার দাদাকে বলব?

না বউদি। সেটা ভালো হবে না। দাদা আমাদের মেলামেশার খবর হয়তো জানে না, তুমি যদি না বলে থাকো।

না, আমি বলিনি, তোমার দাদার সঙ্গে কথা বলার মতো বাড়তি সময় পাই নাকি? সপ্তাহে একবার-দুবার কলকাতায় অপারেশন করতে যায়, তার ওপর প্রায় সময়েই কনফারেন্সে হিল্লি-দিল্লি যাচ্ছে, বাকি সময়টা নার্সিং হোমে থাকতে হচ্ছে। দোষ দিচ্ছি না, ভালো সার্জনের ব্যস্ততা তো থাকবেই। ওই ফোন বাজল, বোধহয় নার্সিং হোম থেকে জরুরি কল।

যাই...

শর্মিলা ব্যস্ত হয়ে চলে যাওয়ার পর বাবলু উঠে বাতি নিবিয়ে দিল। দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল বিছানায়, তারপর কী ভেবে উঠে সিডিতে একটা সেতার চালিয়ে দিয়ে ফের শুয়ে পড়ল।

একসময়ে সে সেতারের ভক্ত ছিল খুব। জীমূতবাহন নামে একজন সেতারি ছিলেন এ শহরে। নামজাদা লোক নন। তবে প্রাথমিক পাঠ দেওয়ার পক্ষে চমৎকার। তাঁর কাছেই শিখত। জীমূতবাহন তার ভেতরে বড়ো সেতারি হওয়ার সম্ভাবনা দেখেছিলেন বলে মন দিয়ে তালিম দিতেন।

কিন্তু বাবলু সময় দিতে পারল কই? ডাক্তারি পড়তে গিয়ে পড়ার চাপে সেতার বন্ধই হয়ে গেল একরকম। আজকাল হাসপাতালের লাগোয়া কোয়ার্টারে মাঝে মাঝে বাজায় বটে, কিন্তু সেই আবেগ আর নেই।

বাইরে গাড়ির শব্দ হল কি? হ্যাঁ, দাদা তাহলে নার্সিং হোমেই গেল।

কেন? রাখীর কি অবস্থা খারাপ?

তার মোবাইল ফোন তুলে সে নার্সিং হোমে ডায়াল করল।

পিউ মজুমদারকে একটু দেবেন?

একটু বাদে পিউ ফোন ধরল, বলো।

আমি বাবলু, দাদাকে কল করা হল কেন?

ভয় নেই। এটা অন্য কেস। রাখী স্টেবল আছে, ঘুমোও।

২. ঘুম কমে যাচ্ছে

ধীরে ধীরে ঘুম কমে যাচ্ছে বিশ্বদেবের। আটান্ন বছর বয়সে তার স্বাস্থ্য রীতিমতো পেটানো। মেদের বাহুল্য নেই। তেমন কোনো রোগ নেই। অসুখ-বিসুখ নেই। তবে হ্যাঁ, চিন্তা আর টেনশন যথেষ্ট আছে। সেটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিশ্বদেব রীতিমতো যোগব্যায়াম করে, সকালে নিয়ম করে হাঁটে, নিয়মিত সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে সিটিং দেয় এবং দীক্ষা নেওয়ার কথাও সিরিয়াসলি ভাবছে। তার বউ রুচিরা একটু উন্নাসিক মহিলা। আর্ট, কালচার, মার্গসংগীত ইত্যাদি তার প্রিয় বিষয়। এ-শহরে তার একটা কালচারাল সেন্টার আছে। সেখানে আর্ট এগজিবিশন, পেইন্টিংয়ের এগজিবিশন, ফ্লাওয়ার শো, বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার ইত্যাদি হয়ে থাকে। মফস্সল শহরে অবশ্য এগুলো তেমন ঢেউ তোলে না। তবে রুচিরা হাবেভাবে বুঝিয়ে দেয়, ব্যবসায়ী এবং ধনী স্বামীটির চেয়ে সেরিব্রাল ব্যাপারে বা রুচিতে সে অনেক ওপরে। বিশ্বদেব স্ত্রীর এই অহংকারটুকু মেনে নেয়। সস্নেহ প্রশ্রয়ই দিয়ে থাকে। সত্যি কথাটা হল, রুচিরাকে আর তার প্রয়োজনই হয় না। রুচিরা তার মতো আছে থাকুক। বিশ্বদেব ভালোই জানে, তার বিপুল বৈভব রুচিরাকে যে শক্ত জমিটি দিয়েছে তার ওপর দাঁড়িয়েই ওর যত কালচার-গোঁড়ামি।

কাল রাতে ঘুম না হওয়ার কারণ হল রাখী। রাখী কেন মরতে চায় বা কে ওকে মারতে চায়, এটা নিয়ে অনেক রাত অবধি ভেবেছে সে। তবে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। তা ছাড়া কাল রাতেই সে আবছাভাবে বুঝতে পেরেছে, তার ছোটো ছেলে বাবলুর সঙ্গে রাখীর একটা ভাব-ভালোবাসার সম্পর্ক রচিত হয়েছে। সেটা যে কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না, এটাও তার দুশ্চিন্তার বিষয়। কাজেই আজ সকালে বেশ ক্লান্ত বোধ করছে বিশ্বদেব।

আজ সকালের অবসাদ তাকে মর্নিং ওয়াকে পর্যন্ত যেতে উৎসাহিত করেনি। সকালে সামনের চওড়া বারান্দায় শীতের রোদে বেতের সোফায় বসেছিল সে। সামনে চমৎকার বাগান। গাড়ি-বারান্দাটি অর্ধচন্দ্রাকার, মোরামের রাস্তা চলে গেছে সামনের ফটক অবধি।

ফটক দিয়ে একটা লম্বা চেহারার ছেলে ঢুকল। পরনে জিনসের প্যান্ট, গায়ে শার্টের ওপর জিনসেরই একটা জ্যাকেট। গালে ঘন দাড়ি আর গোঁফ আছে। এ-বাড়িতে লোকের অবারিত দ্বার। কারণ বিশ্বদেবের কাছে সারাদিন নানা কাজে নানা লোক আসে। ফটকে দারোয়ান মোতায়েন আছে বটে, কিন্তু কাউকে আটকানোর হুকুম নেই। শুধু ভিখিরিদের ঢুকতে দেওয়া হয় না, ফটক থেকেই তাদের পয়সা দিয়ে বিদেয় করে দেওয়া হয়। ছেলেটার ডান কাঁধে একটা ঝোলা, শান্তিনিকেতনি ব্যাগ, যার স্ট্র্যাপ ডান হাতের মুঠোয় চেপে রেখেছে সে, বেশ বড়ো বড়ো সতেজ পদক্ষেপে ছেলেটা হেঁটে এসে বারান্দায় উঠল।

আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

বিশ্বদেব সামনের বেতের চেয়ারটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলল, বসুন।

ছেলেটার বয়স সাতাশ-আটাশ। মুখটা দেখে মনে হয়, খুব রোদে জলে ঘোরে। শরীরটা ছিপছিপে, শক্তপোক্ত, মাথায় অবিন্যস্ত লম্বা চুল। একনজরে দেখে ছেলেটার প্রতি বিরাগ অনুভব করল না বিশ্বদেব। বলল, বলুন।

আপনি আমাকে কতক্ষণ সময় দিতে পারবেন?

কেন, আপনার কি লম্বা কোনো কথা আছে?

হ্যাঁ, আসলে কথাটা শুধু আমার নয়। পৃথিবীর সব মানুষের।

বলেন কী? পৃথিবীর সব মানুষের কথা আপনি একা বলবেন?

ছেলেটা হাসল, তার দাঁতগুলোর সেটিং ভারি চমৎকার।

হাসিটি অতি সরল, বলল ভূমিকাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে, মাপ করবেন। আসলে আমার বিষয় হচ্ছে জল।

জল। মাই গুডনেস? জল সম্পর্কে আমার কাছে কেন? যদি আপনার তেষ্টা পেয়ে থাকে, তাহলে অন্য কথা।

আমাকে একটু বুঝিয়ে বলতে দিন। আপনি নিশ্চিত জানেন যে, ধীরে ধীরে পৃথিবীর আবহাওয়া গরম হচ্ছে। গ্রিনহাউস এফেক্টের ফলে গ্লোব ওয়ার্মিং সম্পর্কে আজকাল পৃথিবী জুড়েই কথা হচ্ছে, দক্ষিণ মেরুর ওপরে ওজোন স্তরের ফুটো থেকেই আমাদের পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কিছুটা অনিশ্চিত।

হ্যাঁ জানি, সেজন্যে আমরা সবাই চিন্তিত।

বটেই তো। সবাই চিন্তিত, আর সেইজন্যেই আমি ঘুরে ঘুরে আমাদের জলের প্রাকৃতিক উৎসগুলি দেখছি। উত্তর বা দক্ষিণ মেরুর বরফ গলতে শুরু করলে সমুদ্রের জলস্তর ওপরে উঠবে, পৃথিবীর অনেক স্থলভূমি ডুবে যাবে, অনেক দেশ হয়ে যাবে নিশ্চিহ্ন, তেমনি বিপদ আমাদেরও। হিমালয় এবং অন্যান্য পর্বতমালার হিমবাহগুলি আমাদের বেশির ভাগ নদীর উৎস। হিমবাহগুলি গলে গেলে আমাদের নদীগুলিতে ভয়ংকর প্লাবন দেখা দেবে। একটা নদীর বদলে হাজারটা জলধারা সমভূমিকে প্লাবিত করে সমুদ্রে গিয়ে মিশবে। বিস্তর মানুষ মারা পড়বে। শহরগুলি ভেসে যাবে। কিন্তু তারপর আরও একটা ভয়ংকর বিপদ হবে।

সেটা কী?

হিমবাহ গলে প্রাথমিক প্লাবনের পর নদীগুলোর উৎস বলে আর কিছু থাকবে না। নদীর খাত যাবে শুকিয়ে। দেখা দেবে সাংঘাতিক জলসংকট। আশঙ্কা করা হচ্ছে, আগামী কুড়ি

ত্রিশ বছরের মধ্যেই এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে আমাদের। হিমালয়ে বরফ বলে যদি কিছুই না থাকে, তবে কী হবে, তা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছেন।

পারছি। কিন্তু আপনি কী করতে চাইছেন?

সময় থাকতেই যাতে কতগুলি ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেইজন্যেই আমি বিভিন্ন মানুষের কাছে যাচ্ছি। ভবিষ্যতের ভয়ংকর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমার কিছু প্রজেক্ট আছে। একটা হল যতটা সম্ভব সোর্সের কাছাকাছি বাঁধ দিয়ে হিমবাহের জল আটক করা। দ্বিতীয় প্রজেক্ট হল কয়েকটা নিকাশি খাল বের করা, আর হাইডেল তৈরি করা।

এসব নিয়ে পৃথিবীর বিশেষজ্ঞরা কি ভাবছেন না?

হ্যাঁ, অবশ্যই ভাবছেন, ধরে নিন আমার ভাবনাও তাঁদের প্রতিধ্বনি।

আপনি কি একজন বিশেষজ্ঞ? টেকনিক্যাল ম্যান?

না। আমি টেকনিক্যাল ম্যান বা অথোরাইজড পারসোনাল নই। তবে আমি একটি কোম্পানিতে চাকরি করি। কনসালটেন্সি ফার্ম, তাদের কাজই হল ডিজাস্টার অ্যান্টিসিপেট করে আগাম ব্যবস্থাপত্র তৈরি করা।

এসব বিগ প্রজেক্টের ব্যাপার, আমি কী করতে পারি বলুন। আমি একটা ছোট্টো শহরের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মাত্র।

সেটাও কম কথা নয়। আপনার শহরের ধার দিয়ে আর মাঝখান দিয়ে দুটো ছোট্ট নদী বয়ে গেছে। এদের সোর্স পাহাড়ে। এই সোর্স আমি দেখে এসেছি। আমার মনে হয়েছে, সোর্সের দিকে মাইল দশেক ভেতরে একটা বড়ো ভ্যালি আছে। দু-দিকে পাহাড়, জলটা এখানে আটকাতে পারলে একটা বিশাল ন্যাচারাল বেসিন তৈরি করা যাবে, হাইডেল প্রজেক্টের পক্ষেও চমৎকার জায়গা।

ওটা আমার এলাকা নয়।

তাও জানি। আমি শুধু বলতে চাইছি, এই এলাকা আপনি খুব ভালো চেনেন। এই প্রোপোজালের এগেনস্টে কোথাও অবজেকশন উঠতে পারে কিনা, সেটা জানতেই আপনার কাছে আসা।

আপনার কোম্পানির নাম কী?

গ্লোবাল ফ্রেণ্ড ইনকরপোরেটেড।

নামটা চেনা ঠেকছে না।

নামটা শুনে প্রভাবিত হওয়ার মতো বড়ো কোম্পানিও নয়। তবে সরকার এদের অ্যাপয়েন্ট করেছে।

অ্যাপয়েন্ট করেছে মানে কি কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়ে গেছে?

না। আপনাকে তো আগেই বলেছি, আমাদের কোম্পানি কিছু সাজেশন দেয়। সেটা অ্যাকসেপ্ট করা বা না-করা সরকারের মর্জি, সরকারি বাজেটেরও প্রশ্ন আছে।

আপনারা বাঁধ দেওয়ার কথা বলছেন, ভালো কথা, কিন্তু হাইডেল তো অনেক টাকার ব্যাপার।

বড়ো প্রজেক্টের জন্যে অনেক টাকা দরকার বটে, কিন্তু ছোটো মিনি হাইডেল অনেক কম খরচে করা যায়। আমরা জল সংরক্ষণের সঙ্গে হাইডেলটা সবসময়েই জুড়ে দিই। তার কারণ, ভবিষ্যতে পৃথিবীতে যখন ফুয়েল ক্রাইসিস দেখা দেবে, তখন এই হাইডেলগুলোর গুরুত্ব অনেকগুণ বেড়ে যাবে। উঁচু জায়গা থেকে যে জল নীচে নামবে, তা তো আর আপনা থেকে সোর্সে ফিরে যাবে না। আর তা না গেলে সেইসব সোর্সও শুকিয়ে যাবে। এইসব হাইডেল পাওয়ারের সাহায্যে বাষ্প করে জল আবার সোর্সে

ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে, ভবিষ্যতে এই ওয়াটার সাইকেল ভীষণ প্রয়োজন হবে। ইন ফ্যাক্ট সারাদেশেই আমরা এরকম প্রজেক্টের প্রস্তাব সরকারকে দিচ্ছি।

আপনি টেকনিক্যাল হ্যাণ্ড নন?

না। সেই অর্থে নই।

তাহলে আপনার কোম্পানি আপনাকে এ-কাজে পাঠালো কেন?

ছেলেটি একটু হেসে বলল, বিকজ আই অ্যাম প্যাশনেটলি ইন লাভ উইথ ওয়াটার, জলের চরিত্র বোঝবার জন্য আমি বিস্তর মাথা ঘামিয়েছি। জলের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভূমিকা নিয়েও আমি পত্র-পত্রিকায় কিছু লিখেছি। কোম্পানি আমাকে সেইজন্যই চাকরি দিয়েছে, তবে আমার রিপোর্ট ফেভারেবল হলে কোম্পানির বিশেষজ্ঞ আর আমিনরাও আসবে।

আপনার নাম?

অলোক চক্রবর্তী।

ক্রেডেনশিয়ালস দেখাতে পারেন?

কেন পারব না? বলে অলোক তার ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা ল্যামিনেট করা আইডেনটিটি কার্ড বের করে বিশ্বদেবের হাতে দিল।

বিশ্বদেব ভ্রূ কুঁচকে কার্ডটার দিকে চেয়ে বলল, আপনার ডেজিগনেশন এগজিকিউটিভ। এ শব্দটা খুব ধোঁয়াটে। কোম্পানিতে আপনার পজিশনটা ঠিক বোঝা গেল না।

ওটা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আমি সামান্য বেতনভুক লো-লেভেল কর্মচারী মাত্র।

সরকার যখন আপনার কোম্পানিকে অ্যাপয়েন্ট করেছে, তখন ধরে নিতে হবে আপনার কোম্পানি এলেবেলে নয়। এখন বলুন, আপনি এখানে ঘুরে কী অ্যাসেসমেন্ট করলেন। ফেভারেবল?

হ্যাঁ, খুবই ফেভারেবল। তবে উপত্যকায় কিছু পাহাড়ি মতো গ্রাম আছে, জলাধার হলে সেগুলো ডুবে যাবে। ওই লোকগুলোর পুনর্বাসন দরকার হবে। অবশ্য প্রজেক্ট হলে লোকে কাজও পাবে।

সরকার প্রজেক্ট করার কথা ভাবে ঠিকই, কিন্তু টাকায় কুলিয়ে উঠতে পারে না।

ঠিকই তো। তা ছাড়া এদেশে জোনাল সেন্টিমেন্ট এবং পক্ষপাত আছে, মন্ত্রীরা যে যার নিজের রাজ্য বা এলাকার ডেভেলপমেন্ট করতে চায়। বাধা আছে। তবে তা নিয়ে সরকার মাথা ঘামাবে।

আপনি কতদিন হল এ-শহরে এসেছেন?

প্রায় একমাস।

এতদিন খবর দেননি কেন?

খবর তৈরি হলে অবশ্যই দিতাম। স্পটগুলো ঘুরে দেখে তবেই আপনার কাছে এসেছি।

কোথায় উঠেছেন?

প্রথমে রূপকথা হোটেলে উঠেছিলাম। তারপর পাহাড়ে চলে যাই, শাওন নামে একটা গাঁয়ে এক চাষি পরিবারের সঙ্গে কিছুদিন কাটাই। তারপর হায়ার অলটিচুডে তাঁবুতে থাকতে হয়। গতকাল আমার কাজ একরকম শেষ হয়েছে। ইতোমধ্যে দিল্লি থেকে আমার দু-জন সহকারীও এসে গেছেন। ফলে আমরা পেরেরা সাহেবের বাড়িটা ভাড়া নিয়েছি।

পেরেরার বাংলো?

হ্যাঁ।

তিনজনের জন্যে অত বড় বাড়ি নিয়ে কী করবেন? ভাড়াও তো অনেক।

আমাদের কোম্পানির টেকনিক্যাল হ্যাণ্ডরাও এসে পড়বেন।

বুঝতে পারছি আপনি এক মাসের মধ্যে অনেক কাজ করে ফেলেছেন। কিন্তু আমি কেন জানতে পারলাম না সেটাই ভাবছি।

আমার কাজ ছিল বাইরে, গাঁয়ে, জঙ্গলে আর পাহাড়ে। তাই খবরটা আপনার কাছে আসেনি। তবে হয়তো আমারই উচিত ছিল সব কথা আপনাকে জানানো।

বেটার লেট দ্যান নেভার। এ শহরের যারা এমিনেন্ট পারসোনালিটিজ খবরটা তাদেরও জানানো দরকার। তাই না? ধরুন আপনারা চেষ্টা করলেন, সরকার প্রস্তাবটা মানতে চাইল না। সেক্ষেত্রে এই শহরের মানুষ একজোট হয়ে, আণ্ডার প্রপার লিডারশিপ, সরকারের ওপর প্রেশার ক্রিয়েট করতে পারে। প্রজেক্ট যদি সত্যিই হয় তাহলে আমাদের শহরটার গুরুত্ব অনেক বেড়ে যাবে।

অলোক একটু হাসল, কিছু বলল না।

বিশ্বদেব বলে, তাই নয় কি?

অলোক একটু উদাস গলায় বলে, মুশকিল কী জানেন, সবাই নিজের লোকালিটিস নিয়ে ভাবে। গোটা দেশটা নিয়ে ভাববার লোক ক্রমে কমে যাচ্ছে।

আরে মশাই, আপনি তো আচ্ছা লোক। আপনিই তো বললেন যে, এই জায়গাটা আপনার প্রজেক্টের পক্ষে খুবই সুইটেবল। তাহলে এখন আবার অন্যরকম বলছেন কেন?

অলোক একটু গম্ভীর হয়ে বলে, ভারতবর্ষে নদীর অভাব নেই। সব নদীকেই ঠিকমতো ব্যবহার করলে এবং জলকে কাজে লাগালে গোটা দেশটারই চেহারা পালটে ফেলা সম্ভব। এই প্রজেক্টটা হলে শুধু আপনার শহর নয়, অনেকটা এলাকা জুড়ে একটা পরিবর্তন ঘটবে। হ্যাঁ, আপনার প্রস্তাবটা আমি মানছি। শহরের ইমপর্টেন্ট লোকদের ব্যাপারটা জানানো উচিত এবং প্রয়োজন। আমি বহিরাগত এবং এখানকার বাসিন্দা নই। আমার কথা লোকে শুনবে না বা উলটো বুঝবে। যদি দয়া করে আপনি এটা করেন তাহলে ভালো হয়।

সেটা সহজ কাজ। একটা মিটিং কল করলেই হবে। কিন্তু তার আগে প্রজেক্টের একটা ব্লু প্রিন্ট বা সারভে রিপোর্টের অফিসিয়াল কপি আমার হাতে আসা চাই।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি জানি, আপনি নিজের সোর্স থেকেও খবর পেয়ে যাবেন। তবে আপনাকে এটুকু বলতে পারি যে, কোম্পানি আমার রিপোর্ট অ্যাপ্রুভ করেছে। তাদের সুপারিশ দিল্লির সরকারি দফতরে জমাও পড়ে গেছে। কাজ অনেকটা এগিয়েছে বলেই আমি আপনার কাছে এসেছি।

বুঝেছি। একটু বসুন, চা খান।

না না, ফর্মালিটির দরকার নেই। আপনি আমাকে অনেকটা সময় দিয়েছেন। ধন্যবাদ।

আরে মশাই। বসুন তো। কথা আছে।

অলোক উঠতে গিয়েও একটু হেসে বসে পড়ল।

আপনি পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরেছেন। আমার কাছে খবর আছে যে, ওখানে একস্ট্রিমিস্টরা ডেরা বেঁধেছে। আপনি বিপদে পড়েননি?

অলোক ফের হাসল। বলল, দু-তিনবার বিপদ হয়েছে বটে, তবে একস্ট্রিমিস্টরা গোঁয়ার বা হ্যাঁবিচুয়াল খুনি নয়। তারা আমাকে দুবার ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাদের ডেরায়। চোখ

বেঁধে এবং পিঠে বন্দুক ঠেকিয়ে। ভাগ্য ভালো যে তাদের আমি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে পেরেছি।

আপনার প্রোটেকশন নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। যে সাহসটা দেখিয়েছেন তাতে খুন হয়ে যেতে পারতেন।

আমাকে অন্যান্য জায়গাতেও এই সমস্যায় পড়তে হয়েছে। খানিকটা অভিজ্ঞতা আছে বলে মনে হয়, এরা কেউ সাইকোপ্যাথ কিলার নয়। প্রয়োজনে খুন করে ঠিকই, কিন্তু লোক বুঝে। আর প্রোটেকশন কে দেবে বলুন, এদের কাছে পুলিসও অসহায়। পাহাড় জঙ্গল ওরা নিজের করতলের মতো চেনে, পুলিশ চেনেনা। আমাকে মাঝে মাঝে এটুকু রিস্ক নিতেই হয়।

বিশ্বদেব হাসল, বলল, আপনার মতো বয়সে আমিও রিস্ক নিতে ভালোবাসতাম। কিন্তু আজকাল কেন যেন ভয় জিনিসটা বেড়ে গেছে। একটু আধটু রাজনীতি করি, সেটাই বোধহয় কাল হয়েছে। একটু চা খান। চা, না কফি?

যেকোনোটা। আমার নেশা নেই, চয়েসও না।

রিমোট কলিংবেল টিপে চায়ের সংকেত ভিতর বাড়িতে পাঠিয়ে দিল বিশ্বদেব। তারপর

বলল, আগামীকাল একবার আসতে পারবেন?

কখন বলুন।

সন্ধ্যের পর। ধরুন সাতটা বা সাড়ে সাতটা।

পারব।

আপনার কাগজপত্রও আনবেন। দেখি যদি ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবতে পারি।

ভাববেন, অবশ্যই ভাববেন। পৃথিবীর যে সংকট ঘনিয়ে আসছে তা নিয়ে সিরিয়াসলি আমাদের ভাবা উচিত। কয়লা, ডিজেল পোড়ানো, এসি চালানো, কলকারখানার অত্যধিক বিস্তার, গ্রিনহাউস গ্যাসের যত এমিশন হবে তত বাড়বে ওয়ার্মিং, তত বাড়বে পলিউশন, প্লিজ একটু ভাববেন।

বিশ্বদেব মাথা নেড়ে বলল, অবশ্যই।

চা নিয়ে এল বলরাম, এ-বাড়ির কাজের লোক, ট্রে টেবিলে রেখে বলল, মা একটু ডাকছেন আপনাকে।

বিশ্বদেব অলোকের দিকে চেয়ে বলল, আপনি চা খান, আমি এখনই আসছি।

বাইরের ঘরেই অপেক্ষা করছিল রুচিরা। বলল, ছেলেটা কে বল তো। কী চায়?

কেন? একটা কাজে এসেছে।

চেনো?

চিনতাম না, তবে চেনা হল।

হুটহাট অচেনা ছেলেছোকরার সঙ্গে দেখা করার দরকার কী? গুণ্ডার মতো চেহারা।

গুণ্ডা। কী যে বল। গুণ্ডার মতো হবে কেন?

কী জানি বাপু, স্বস্তি ঘুরে গিয়ে বলল, মা, দেখোগে যাও, বাবার সঙ্গে একটা গুণ্ডার মতো ছেলে দেখা করতে এসেছে।

দুর। ও একটা ভালো কোম্পানিতে চাকরি করে। কিছু খারাপ নয়। আমি তো লোক চরিয়েই খাই, নাকি?

দেখো বাপু, দিনকাল ভালো নয় কিন্তু।

হঠাৎ ওকে দেখে স্বস্তি ভয় পেল কেন? ছেলেটাকে তো আমার বেশ ভালোই লাগছে, শিক্ষিত ছেলে, ভাবনাচিন্তা করে।

চেহারাটা দেখে অবশ্য খারাপ বলে মনে হচ্ছে না আমারও। স্বস্তি কী ভেবে বলল কে জানে।

রুচিরা ভিতরে চলে যাওয়ার পর বিশ্বদেব বারান্দায় এসে দেখে অলোক একইভাবে বসে আছে। চা ছোঁয়নি। গভীরভাবে অন্যমনস্ক।

চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে মশাই, খেয়ে নিন।

অলোক একটু চমকে উঠে বলল, হ্যাঁ, নিই।

আপনাকে কোনো সাহায্য করার দরকার হলে বলবেন, সাধ্যমতো চেষ্টা করব।

তা জানি, এখানে সকলে আপনার প্রশংসাই করে। আপনি এ শহরের জন্য অনেক কিছু করেছেন।

কী আর করলাম বলুন। টাকা নেই, কো-অপারেশন নেই, কো-অর্ডিনেশন নেই, প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে করাপশন। ইচ্ছে থাকলেও ভালো কিছু করা প্রায় অসম্ভব। কনডিশন ফেভারেবল হলে এ শহরের ভোল আমি পালটে দিতে পারতাম।

চায়ের কাপটা রেখে অলোক বলল, এবার আমি আসি?

বিশেষ তাড়া আছে নাকি?

একটু আছে। নার্সিং হোমে একজনকে দেখতে যাব।

কোন নার্সিং হোম?

অলোক হেসে বলে, আপনার নার্সিং হোম।

ওঃ, কে বলুন তো?

হেডমিস্ট্রেস মৃন্ময়ী ভট্টাচার্যের মেয়ে রাখী।

বিশ্বদেব একটা ঢোঁক গিলে বলে, আপনি ওঁদের চেনেন?

সামান্য আলাপ আছে। দিদিমণি আমাকে কয়েকটা ব্যাপারে সাহায্য করেছেন।

ও, আচ্ছা আসুন।

কাল আমি সন্ধ্যেবেলা কাগজপত্র নিয়ে আসব।

হ্যাঁ, আসবেন।

অলোক চলে যাওয়ার পর বিশ্বদেব খানিকক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

৩. নার্সিং হোমটার মালিক

নার্সিং হোমটার মালিক যদিও তার বাবা, তবু কর্মচারীরা সবাই চন্দ্রজিৎ ওরফে বাবলুকে চেনে না। সে কলকাতায় থাকে, এখানে এলেও কদাচিৎ নার্সিংহোমে আসে। সেটা একদিক দিয়ে রক্ষে।

সে রিসেপশনে গিয়ে দাঁড়াল। এ শহরের সবচেয়ে নামজাদা এবং ব্যস্ত নার্সিংহোম। ফলে রিসেপশনে বেশ কয়েকজন লোকের জমাট ভিড়। একটু অপেক্ষা করে সে অবশেষে কাউন্টারে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারল, আমি পিউ মজুমদারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

তরুণী রিসেপশনিস্ট খুব একটা পাত্তা দিল না, বলল, একটু অপেক্ষা করুন। উনি এখন রাউণ্ডে আছেন। সময়মতো খবর দেওয়া হবে।

আমি ওর কাছে যেতে চাই।

সেটা সম্ভব নয়। ভিতরে যাওয়ার নিয়ম নেই।

আমি একজন ডাক্তার, একটু বিশেষ দরকার ছিল। ওঁর সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

মেয়েটি ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, বলছি তো, রাউণ্ড শেষ হলেই খবর দেব।

বাবলু কথা বাড়াতে সাহস পেল না। নিজের পরিচয় দিয়ে সে ঢুকতে পারে বটে, কিন্তু ব্যাপারটা জানাজানি হবে। সে রিসেপশন থেকে বেরিয়ে এসে মোবাইলে পিউকে ধরল।

পিউদি, প্রবলেম।

কী হল?

রিসেপশন আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে না।

আচ্ছা, তুমি কী বলো তো! নিজের পরিচয় দিয়েই তো গটগট করে ঢুকতে পারো, কে বারণ করবে?

না না, বাবা আমাদের প্রোটোকল মানতে শিখিয়েছেন। ওটা করা ঠিক হবে না। এটা ভিজিটিং আওয়ার্সও নয়।

দাঁড়াও, আমি নীচে আসছি।

আসতে হবে না। রাখীর কণ্ডিশনটা কী?

ডাক্তারি ভাষায় বলব?

বলো।

সেমি কোমাটিক। ব্লাড টেস্টে পয়জন অ্যানালাইজিং এখনও হয়নি। মনে হয় ওভারডোজ অফ অ্যালজোলাম।

রেসপণ্ড করছে?

না। এখনও ক্রিটিক্যাল। কেবিনে যাবে?

কেউ দেখে ফেলবে না তো।

না যাওয়াই ভালো। মৃন্ময়ীদি এখনও বোধহয় রাখীর কেবিনে রয়ে গেছেন। ভিজিটিং আওয়ার্স চল্লিশ মিনিট আগে শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু জানোই তো, উনি ইনফ্লুয়েনশিয়াল মানুষ, ওকে কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। আমিও তো ওঁর ছাত্রী।

মৃন্ময়ীদি নাকি বলছেন যে, এটা অ্যাটেম্পট টু মার্ডার?

তাই তো শুনছি।

পুলিশ কী বলছ?

পুলিশ কী কিছু বলে? গোমড়া মুখে আসে যায়। শিবদাস দারোগা হল গোমড়ামুখোদের মধ্যেও যেন আরও গোমড়ামুখো। লোকটাকে কখনো হাসতে দেখিনি।

রাখীর মাথার উণ্ডটা দেখেছে?

হ্যাঁ। ডীপ উণ্ড।

স্ক্যান হয়েছে?

হয়েছে। রিপোর্ট দেয়নি এখনও। অত ভেবো না। পেটে যা টকসিন ছিল তা বের করে দেওয়া হয়েছে। স্যালাইন গ্লুকোজ চলছে। ইউরিনের সঙ্গে খানিকটা বেরোবে। অ্যান্টিডোট দেওয়া হচ্ছে। বয়স কম, শী উইল কাম অ্যারাউণ্ড। ডায়ালিসিস আরম্ভ হয়েছে।

জানি। কেসটা হয়তো ফ্যাটাল নয়। কিন্তু আমার কেসটা ফ্যাটাল।

তোমার আবার কী কেস?

বুঝতে পারছি না রাখীর এই ঘটনার কারণ আমি হতে পারি কিনা। আমাকে মৃন্ময়ী কোনোদিন পছন্দ করতেন না। ইদানিং রাখী করছে না। ব্যাপারটা কী পিউদি?

ভাবছ কেন? মেয়েটা সেরে উঠুক তারপর কথা বলে দেখো।

আমাকে কালকেই ফিরে যেতে হবে। উপায় নেই।

চলে যাও। টেনশন কোরো না। ফোনে আমার কাছ থেকে জেনে নিও।

সে তো-জানবই। কিন্তু আমার অনেক হিসেব নিকেশ উলটে গেল।

কিছু উলটে যায়নি। এ বয়সে ওরকম মনে হয়। মন খারাপ কোরো না তো।

ঠিক আছে পিউদি।

শোনো, বেলা দুটো আড়াইটের সময় একবার এসো। আমি ব্যবস্থা করে রাখব, যাতে চুপটি করে রাখীকে দেখে যেতে পারবে।

ঠিক আছে। ধন্যবাদ।

বাবলু নার্সিং হোমের বাইরে এসে একবার বাড়িটার দিকে ফিরে তাকাল। চারতলা চমৎকার আধুনিক প্ল্যানিং-এর বাড়ি। তিনটে উইং। ভিতরে অত্যাধুনিক সব যন্ত্রপাতিতে সাজানো ব্যবস্থা। শোনা যাচ্ছে, আরও সব যন্ত্রপাতি আসছে। নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র ডাক্তার নভোজিৎকে দেশে আটকে রাখার জন্যই তার বাবা বিশ্বদেব নার্সিং হোমটা করেছেন। বাবলুর এখনও বড়ো ডাক্তার হতে ঢের দেরি। তবে সে বিদেশেই সেটল করবে বলে ঠিক করে রেখেছে।

নার্সিং হোমের সামনে বিস্তীর্ণ বাগান। চমৎকার ফুল-টুল ফুটে আছে।

মাঝখানে চওড়া কংক্রিটের রাস্তা। অত্যন্ত দেখনসই ব্যাপার। নার্সিং হোমটা চলেও বেজায় ভালো। চট করে জায়গা পাওয়া যায় না।

বাবলু নার্সিং হোমটার দিকে কিছুক্ষণ অর্থহীন চেয়ে রইল। তারপর ধীর পায়ে বেরিয়ে হাঁটতে লাগল।

বাড়িতে ঢোকবার মুখে পুলিশের জিপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভ্রূ কোঁচকাল সে। পুলিশ এল নাকি?

বারান্দায় দু-জন সাদা পোশাকের অফিসার। এদের চেনে বাবলু। রমেন আর দীপক।

একটু থমকে বলল, কী হয়েছে?

রমেন গম্ভীর মুখে বলল, বড়োবাবু ভেতরে অপেক্ষা করছেন। যাও।

শিবদাসের চেহারাটা একটু রুক্ষ এবং শুষ্ক। বেশ লম্বা হাড়ে-মাসে চেহারা, উঁড়ো গোঁফ আছে। মুখে হাসি বা স্মিতভাব কখনও দেখা যায় না। চেহারার মতো স্বভাবটাও কেঠো এবং রসকষহীন। তবে হাঁকডাক নেই, রগচটা মানুষ নন, ঠাণ্ডা মাথার বিচক্ষণ মানুষ।

অন্য সোফায় মা, বউদি আর স্বস্তিও বসে আছে। চুপ, উদ্বিগ্ন।

শিবদাস বললেন, তোর জন্যই বসে আছি।

কেন শিবদাসকাকু, কী হয়েছে?

তেমন কিছু নয়। কয়েকটা কথা জানার আছে। তবে এখানে নয়, একটু বাইরে চল।

মা উদ্বেগের গলায় বলে, কোনো চার্জ নেই তো।

শিবদাস উদার গলায় বলেন, আরে না, ওসব নয়। কতগুলো ক্লারিফিকেশনের ব্যাপার আছে। কিছু চিন্তা করবেন না। আধঘণ্টা বাদেই ফেরত আসবে।

বাবলু শিবদাসের পিছু পিছু গিয়ে জিপে উঠল।

থানায় নিজের ঘরে মুখোমুখি চেয়ারে বসিয়ে শিবদাস বলল, ব্যাপারটা কী রে?

কোন ব্যাপার?

তোর আর রাখীর মধ্যে কোনো অ্যাফেয়ার আছে নাকি?

বাবলু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, ছিল।

ছিল মানে, এখন নেই?

হ্যাঁ।

পরিষ্কার করে বল, তোদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে?

না। রাখী অ্যাভয়েড করছে।

কেন?

জানি না।

তুই কাল ঠিক কখন রাখীদের বাড়ি গিয়েছিলি?

বেলা দেড়টা-দুটো।

কী হয়েছিল? এনি শো-ডাউন?

না। ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

কিন্তু রাখী তো বাড়িতে ছিল।

ছিল, কিন্তু দরজা খোলেনি, সম্ভবত কি-হোল দিয়ে আমাকে দেখতে পেয়েছিল।

ভালো করে ভেবে দেখিস, কোনও খাড়াখাড়ি হয়েছিল কিনা, মেয়েটা তো অকারণে সুইসাইড অ্যাটেম্পট করতে পারে না।

ও কেন এ কাজ করল আমি জানি না। বেশ কিছুদিন হল আমি ফোন করলে ও দু-একটা কাটাকাটা কথা বলে ফোন রেখে দেয়।

যদি মেয়েটা বেঁচে যায় তাহলে ঝামেলা নেই। কিন্তু বাইচান্স মারা গেলে তোকে আবার ডাকতে হবে। মৃন্ময়ী দিদিমণি এটাকে মার্ডার মনে করছেন।

ও ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই।

কলকাতায় যাচ্ছিস কবে?

কালই যেতে হবে।

যা। আর মনে রাখিস, রাখী বেঁচে উঠলেও এখন কিছুদিন ওর সঙ্গে কমিউনিকেট করিস না।

কেন কাকু?

ব্যাপারটা কমপ্লিকেটেড হয়ে উঠতে পারে।

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

কতগুলো সত্য আছে যা খুব ক্রুয়েল। এই যেমন তোর আর রাখীর ব্যাপারটা। রাখী যদি তোকে না চায় তাহলে স্পোর্টসম্যানের মতো ব্যাপারটা মেনে নেওয়াই তো ভালো। না হলে তোর বিরুদ্ধে আমাকে ব্যবস্থা নিতে হয়। ইভটিজিং-এর দায়ে। সেটা তার ফ্যামিলির পক্ষে সম্মানজনক হবে কি?

কেউ কি এরকম কোনো কমপ্লেন করেছে?

মৃন্ময়ী দিদিমণি ওরকমই একটা হিন্ট দিয়ে রেখেছেন।

উনি আমাকে পছন্দ করেন না জানি। কিন্তু এতটা করবেন তা জানা ছিল না।

তুই একজন ব্রাইট ইয়ংম্যান। কাঁচা বয়স। এসব কাফ লাভের তেমন কোনো দাম নেই। বরং কিছুদিন দূরে থাক, সব ঠিক হয়ে যাবে।

আপনি বলছিলেন, রাখী মারা গেলে ব্যাপারটা কমপ্লিকেটেড হবে। কেন কাকু?

সেক্ষেত্রে সুইসাইড না হয়ে মার্ডার বলে প্রমাণ হলে আমাদের তদন্ত করতে হবে। তখন বোধহয় তোকেও ফের টেনে এনে নতুন অ্যাঙ্গেলে তদন্ত করার প্রয়োজন দেখা দেবে। তবে রাখী বেঁচে যাবে বলেই মনে হয়। তোকে সাবধান করে দেওয়া দরকার বলেই ডেকে এনেছি। কিপ অ্যাওয়ে ফ্রম হার।

আমি এখনও কিছু বুঝে উঠতে পারলাম না।

আমিও না। এখন বাড়ি যা।

আমার অ্যাবসেন্সে এমন কি ঘটল যে সব সম্পর্ক পালটে গেল। আমাকেই বা আপনি এসব বলছেন কেন? কাকু, ব্যাপারটা খোলাখুলি আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন।

বোঝানোর কিছু নেই রে পাগলা। শুধু বলি, কলকাতায় ফিরে যা, লেখাপড়ায় মন দে, এখানকার ঘটনা-টটনা ভুলে যা।

তাই কি হয় নাকি কাকু? ইচ্ছে করলেই সব ভুলে যাওয়া যায়?

চেষ্টা কর। তুই তো মানী লোকের ছেলে। আত্মসম্মানবোধ তো তোরও আছে। একটা মেয়ে যখন তোকে রিফিউজ করছে তখন তুই তার পেছনে লেগে থাকবি কেন? কাজকর্মে মন দে, হৃদয়ের ব্যাপার-স্যাপার ভুলে যেতে সময় লাগবে না।

আমি বাচ্চা ছেলে নই কাকু যে, ওভাবে আমাকে ডাইভার্ট করবেন। রাখীকে না হয় আমি ডিস্টার্ব করব না, ব্যাপারটাও ভোলবার চেষ্টা করব, কিন্তু তা বলে কারণটা না জেনে তো সেটা করতে পারি না। এর কারণটা কী তা আমাকে জানতেই হবে।

এখন বাড়ি যা, মাথা ঠাণ্ডা কর।

৪. আজ রিলিভড

আপনাকে আজ রিলিভড দেখাচ্ছে। তার মানে কি রাখী এখন আউট অফ ডেঞ্জার?

মৃন্ময়ী মাথা নেড়ে বললেন, না। ডাক্তাররা প্রাণপণ চেষ্টা করছে, চিকিৎসার কোনো ক্রুটি হচ্ছে না সেটা ঠিক। তবে হার্ট আর কিডনিতে কিছু প্রবলেম ডেভেলপ করেছে বলে শুনছি।

এখানকার ডাক্তাররা ভালো বলেই তো জানি।

হ্যাঁ। তাঁরা ভরসা দিচ্ছেন। তুমি বুঝি আজ রাখীকে দেখতে গিয়েছিলে?

হ্যাঁ। দুপুর বেলা। দুপুর বেলা।

ও সময়টায় তো ভিজিটিং আওয়ার্স নয়।

না। বলে-কয়ে ঢুকে গিয়েছিলাম।

বলে-কয়ে? সেটা আবার কীরকম?

ভিজিটিং আওয়ারর্সে ভিড় হয়, অপেক্ষা করতে হয়। অন্য সময়ে ওসব ঝামেলা থাকে না। দারোয়ানকে মিষ্টি কথায় রাজি করানো যায়।

আর ধরা পড়লে?

আমি খুব একটা বীরত্ব দেখাতে যাই না। ভদ্রভাবে, বিনীত গলায় কথা কইলেই দেখি কাজ বেশি হয়।

অন্যসময় হলে নার্সিং হোমের নিয়ম ভাঙার জন্য তোমাকে হয়তো বকতুম। এখন আমার মাথার ঠিক নেই। রাখীকে দেখে তোমার কী মনে হল বলো তো। বাঁচবে মনে হয়?

হ্যাঁ। নিশ্চয়ই বাঁচবে।

শুধু মুখ দেখেই বলছ?

মুখেও তো কিছু ছাপ থাকে।

তার মানে?

শরীরের ভেতরকার জ্বালা-যন্ত্রণা বা অসুখের একটা ইমপ্রেশন মুখে প্রকাশ পায়।

কী জানি বাপু, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

কী বলো তো।

আপনি কিছু মনে করবেন না তো?

মনে করার মতো কথা নাকি?

একটু সেনসিটিভ হয়তো।

হোক গে, বলো।

রাখীর বাবাকে কি একটা খবর দেওয়া উচিত নয়?

মৃন্ময়ী একটু অবাক হয়ে অলোকের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, তার দরকার নেই। সে তো আর আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি।

কিন্তু এটা তো একটা উদ্বেগজনক পরিস্থিতি। উনি হয়তো পরে জানতে পেরে দুঃখিত হবেন। হয়তো অভিমান করে আছেন বলে সম্পর্ক রাখেন না। খবর পেলে হয়তো এসে হাজির হবেন।

মৃন্ময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, তাঁকে আমি ভালোই চিনি। অনেক বছর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। আমাদের সম্পর্কে কোনো আগ্রহ থাকলে খোঁজখবর তো করত। তাকে খবর দেওয়ার মানেই হয় না।

আপনি যদি রাগ না করেন বলি, আপনি কি কখনো তাঁর খোঁজ করেছেন?

তা করিনি সত্যি। তেতো সম্পর্কের জের টেনে কী হবে বল।

সে তো ঠিক কথাই।

তা ছাড়া সে চলে যাওয়ার পর কোথায় গেছে, কী করছে, এমনকী বেঁচে আছে কি না। তাও তো জানি না। তোমার বোধহয় কথাগুলো শুনতে ভালো লাগছে না।

কথাগুলো ভালো লাগারও তো কথা নয়। নিষ্ঠুর সত্য। আমাদের সবাইকেই জীবনে এরকম কিছু সত্যকে মেনে নিতে হয়। ভালো না লাগলেও। তিনি ঠিক কীরকম মানুষ ছিলেন, ডমিনেটিং?

না না, বরং উলটোটা। মুখচোরা, লাজুক গোছের।

আমিও সেরকমই শুনেছি।

কার কাছে শুনেছ?

লোকের কাছে। রাখীর কাছেও।

মুখচোরা, লাজুক এবং অনেস্ট, ঠিক কথা। কিন্তু দায়িত্বজ্ঞানহীন, আনকেয়ারিং, ক্যালাস এবং অলস। স্বামী-স্ত্রীর ভেতরকার সম্পর্কটাই গড়ে উঠল না তার সঙ্গে আমার।

রাখী কি তাকে মিস করে?

করারই কথা। আফটার অল বাবা তো। তবে আগে যতটা করত ততটা তো আর এখন নয়। ভুলে গেছে। রাখী কি তার বাবার কথা তোমাকে কিছু বলেছে অলোক?

সামান্যই।

লোকে যা বলে তাকে গুরুত্ব দিও না। বেশির ভাগ লোকই স্ক্যাণ্ডাল ভালোবাসে। অ্যাপারেন্টলি রমেন ভট্টাচার্যকে ভালো লোক মনে হলেও আমি তার অন্য রূপটাও জানি।

সেটা বোধহয় খুবই খারাপ?

হ্যাঁ, ভীষণ খারাপ। প্রসঙ্গটা আজ থাক অলোক।

আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম রমেনবাবুকে এ সময়ে একটা খবর দেওয়া বোধহয় দরকার।

খবর দিতে চাইলেও উপায় নেই। সে কোথায় আছে তা জানি না।

আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।

তুমি। তুমি কি করে জানবে?

অলোক একটা বড়ো শ্বাস ছেড়ে বলল, আমি তাঁকে চিনি।

চেনো। মাই গড, তুমি রমেনকে চেনো? কীভাবে?

আপনি তো জানেন যে, রমেন ভট্টাচার্য একসময়ে দারুণ ছাত্র ছিলেন। নকশাল মুভমেন্টে অ্যাক্টিভিস্ট হওয়ায় লেখাপড়া ছাড়তে হয়।

জানি। জানব না কেন?

ফিজিক্স অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলেন, ডিভোর্সের পর উনি দিল্লি থেকে এম.এস.সি. করেন।

এতদিন পর?

এরপর চাকরি ছেড়ে বিদেশে যান। ভালো জার্মান জানতেন বলে সুবিধে হয়ে যায়। একটু বেশি বয়সে পি.এইচ.ডি. করেন। তারপর গবেষণা। এখন গ্লোবাল ফ্রেণ্ড-এর ইস্ট এশিয়ার ওয়ান অফ দি ডিরেকটরস।

খুব ভালো চাকরি বোধহয়।

খুব। বেশির ভাগ সময়ে ম্যানিলা আর টোকিয়োয় থাকেন।

বিয়ে করেনি?

না। কাজপাগল মানুষ।

আগে খুব কুঁড়ে ছিল।

মনের মতো কাজ পেলে আলস্য থাকে না।

রমেন ভট্টাচার্যের উন্নতির গল্প শুনে আমার কী হবে বল।

কথায় কথায় বলে ফেললাম বটে, ভাবছি না বললেই হত।

না ঠিকই করেছ। এক সময়ে তার ঘর করেছি, সেটা তো আর মুছে ফেলতে পারি না। তবে রাখীর ব্যাপারে তাকে টেনে আনার কোনো দরকার নেই। তুমি তাকে কতটা চেনো?

ভালোই চিনি। ইন ফ্যাক্ট তিনি আমার এখনকার ওয়ার্ক প্ল্যান অ্যাণ্ড প্রোগ্রাম ঠিক করে দিয়েছেন। এখানে যে একটা ন্যাচারাল প্রসপেক্ট আছে সেটা তিনিই প্রথম কোম্পানিকে জানান।

তোমাদের কোম্পানি কি খুব বড়ো?

হ্যাঁ। খুব বড়ো, তবে যতটা বড়ো ততটা বিজ্ঞাপিত নয়। গ্লোবাল ফ্রেণ্ড শুধু লাভ করার জন্য কাজ করে না। তাদের আসল লক্ষ্য পৃথিবীর কল্যাণ। কনসালটেন্সি এবং ওয়েলফেয়ার কাউনসেলিংকে ভিত্তি করেই তাদের যত কর্মকান্ড। কোর গ্রুপে কয়েকজন সায়েন্টিস্ট-এর সঙ্গে কয়েকজন ফিলজফার, ইকনমিস্ট এবং ইকোলজিস্ট যেমন আছেন, তেমনি আছেন কবি লেখক, পেইন্টার এবং সাংবাদিকও। এঁদের সকলের গুরুত্বই কিন্তু সমান। আচ্ছা থাক, এসব কথা হয়তো আপনার এখন বোরিং লাগবে।

না, শুনে ভালোই লাগছে। তবে আমার মনের অবস্থা তো বুঝতেই পারছ, ভালো কথার ওজন বুঝতে সময় লাগবে। শুনলাম তুমি বিশ্বদেববাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলো।

হ্যাঁ।

কেন?

উনি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। অনেক আগেই ওঁর সঙ্গে আমার দেখা করা উচিত ছিল।

কী কথা হল?

কাজের কথা। উনি আজ রাতে আমাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছেন।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। আমার বিষয়টাতে উনি বেশ ইন্টারেস্ট নিলেন।

ভালো। বিশ্বদেবকে যদি ব্যাপারটা বোঝাতে পার তবে উনি প্রাণপণে তোমাকে সাহায্য করবেন।

সেটা জানি।

লোকটাকে কেমন লাগল?

ভালোই তো?

একটু চুপ করে থেকে মৃন্ময়ী আনমনা হয়ে বলে, বিশ্বদেব খুব ভালো। আমার স্কুলের জন্য যখনই যা করতে বলেছি, করেছে। এ শহরটার অনেক দৈন্য আর অব্যবস্থা দূর করেছে।

হ্যাঁ, ওঁর বেশ সুনাম আছে।

দুর্নামও শুনতে পাবে। নার্সিং হোমটা নিয়ে কম কান্ড হয়েছে? কেউ কেউ তো বলেছিল ওটা নাকি চুরির টাকা। মিউনিসিপ্যালিটির টাকা গাপ করে নার্সিং হোম হয়েছে। অথচ লোকের অজানা নেই যে, বিশ্বদেবের বেশ প্রফিটেবল একটা বিজনেস আছে। আর নার্সিং হোম তো হয়েছে ব্যাংকের লোন নিয়ে। এদেশে কেউ কোনও ভালো লোককেও সহ্য করতে পারে না। যেন ভালোটাই খারাপ।

অলোক একটু হাসল। তারপর বলল, তাহলে কি রমেনদাকে কিছুই জানাব না?

তোমার সঙ্গে বোধহয় রমেনের খুব যোগাযোগ আছে।

বললাম তো, আমাদের প্রোগ্রামের ডাইরেকটিভস উনিই দেন। রোজই কথা হয়।

আমাদের কথা জানতে চায় বোধহয়?

না। উনি কখনো আপনার বা রাখীর কথা জানতে চাননি।

বাঃ বেশ। তাহলে আমাদেরই বা জানানোর কী দায়?

আপনি না চাইলে জানানোর প্রশ্নই নেই।

তবে কথাটা তুললে কেন অলোক? যা চুকেবুকে গেছে তাকে ফের খুঁচিয়ে তোলার কোনো অর্থই নেই। তাই না?

সিচুয়েশনটা সিরিয়াস বলে মনে হয়েছিল, তাই ভেবেছিলাম, ওঁকে জানানোটা বোধহয় প্রয়োজন।

অলোক আর বসল না। অস্পষ্টভাবে আজ আসি বলে উঠে চলে গেল।

অলোক চলে যাওয়ার পর মৃন্ময়ী অনেকক্ষণ পাথরের মত নিস্পন্দ বসে রইলেন। তারপর হঠাৎ সম্বিৎ পেয়ে বিশ্বদেবের মোবাইলে ফোন করলেন।

ফ্রী আছ? কথা বলতে পারবে?

পারব। কী হল, গলা অত উত্তেজিত কেন?

উত্তেজিত নই, উদ্বিগ্ন।

কেন? আমি তো খবর নিয়েছি, রাখী ইজ কামিং অ্যারাউণ্ড।

রাখীর জন্য নয়।

তাহলে?

তুমি তো অলোককে চেনো।

পরিচয় হয়েছে। ব্রাইট, ডেডিকেটেড ছেলে।

দুটো ব্যাপার বলছি। মন দিয়ে শোনো। ওর সঙ্গে রাখীর চেনা আছে। পিকনিক করতে গিয়ে ওদের পরিচয় হয়। দু-একবার বাড়িতে এসেছে। ছেলেটাকে আমার বেশ ভালো লেগেছিল।

হ্যাঁ, ভালো লাগার মতোই তো ছেলে।

কিন্তু তুমি কি জানো যে, রমেন ভট্টাচার্য ওর বস!

সে কী? রমেন তো সরকারি চাকরি করত।

আমরা তো আর তার খোঁজ রাখিনি। রমেন অবশ্য বরাবর ভালো ছাত্র ছিল। নকশাল হয়ে পড়াশুনো ছাড়ে। ডিভোর্সের পর নাকি চাকরি ছেড়ে পড়াশুনো শুরু করে। বিদেশে গিয়ে পি.এইচ.ডি. করেছে। এখন গ্লোবাল ফ্রেণ্ডে বড়ো চাকরি করে।

খুবই অবাক কান্ড। রমেনের বয়স কত হল বলো তো।

আমার সমান। তিপ্পান্ন-চুয়ান্ন।

বুঝলাম। কিন্তু তোমার উদ্বেগের কী আছে?

আছে। অলোক রমেন ভট্টাচার্যকে চেনে, ভাবসাবও আছে। ভাবছি, আমাদের কথা আবার বলে দেয়নি তো।

রমেন এমনিতে চাপা স্বভাবের মানুষ। তবে বলা যায় না।

আজ অলোক খুব ধরেছিল রাখীর ঘটনাটা রমেনকে জানানোর জন্য।

আমি রাজি হইনি।

ঠিকই তো করেছ।

সেটা বুঝতে পারছি না। ধরো রমেন ভট্টাচার্য যদি সত্যিই রাখীর বায়োলজিকাল বাবা হত, তাহলে আমি অত স্ট্রংলি অপোজ করতে পারতাম না। অলোক হয়তো সেটাই দেখতে এসেছিল, আমি আপত্তি করি কিনা। হয়তো ও জানে যে রাখী রমেনের মেয়ে নয়। কার মেয়ে সেটাও হয়তো জানে।

ঘাবড়ে যেও না। শুধু হানচ থেকে ডিডাকশন করা ঠিক নয়। চুপচাপ থাকো।

আমার মনে হচ্ছে, আমি মনের দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ছি। মেয়েটার এই ঘটনা আমাকে এত ভেঙে ফেলেছে।

রাখীর জন্য আমিও তো ভাবছি। কিন্তু মার্ডার অ্যাটেম্পট বলে তুমি শিবদাসকে ক্ষেপিয়ে তুলছ কেন?

আমার খুব মনে হচ্ছে, ওকে কেউ খুন করার চেষ্টা করেছে।

যে খুন করে সে এভাবে জটিল পথে করবে না। সে টপ করে কাজ সারবে। ছুরি মারবে, গুলি করবে বা গলা টিপে মারবে। বিষ খাওয়াতে যাওয়াটা বোকামি।

একটা কথা বলব? কিছু মনে কোরো না।

বলো। ইদানিং জানতে পেরেছি, বাবলু আর রাখী প্রেমে পড়েছে। কী ঘেন্নার কথা বলো।

উড়ো কথা আমারও কানে এসেছে।

তুমি সামলাও। নইলে কী বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে বলো তো।

রাখী ভালো হয়ে উঠলে তুমি ওকে অন্যভাবে বোঝানোর চেষ্টা কোরো।

কী বলে বোঝাব? নিজের পাপের কথা কবুল করব?

পাপ কেন হবে! পাপ বলছ কেন? রমেন ভট্টাচার্যের বাবা হওয়ার ক্ষমতা ছিল না, তাই তোমাকে অন্য পন্থায় মা হতে হয়েছে। পাপের কথা উঠছে কেন?

ওভাবে বোলো না। রমেনের বাবা হওয়ার ক্ষমতা তো পরীক্ষা করা হয়নি। তবে সে বাবা হতে চাইত না। ওই একটা ব্যাপারে তার বিরাগ ছিল। অতিরিক্ত বন্ধন সে পছন্দ করত না। এসব তো তুমি জানো।

ক্ষমতা ছিল না বলেই চাইত না। ঠিক আছে, প্রসঙ্গটা থাক। বলছি, এখন মাথা ঠিক রাখো। পরিস্থিতি জটিল করে তুললে মুশকিল হবে। অ্যাণ্ড ডোন্ট ক্রাই মার্ডার।

নইলে রাখী সুইসাইড করতে যাবে কেন বল। এমন তো কিছু ঘটেনি যাতে মরতে হবে।

এখনকার জেনারেশনকে তুমি কতটা বোঝো? তুমি শিক্ষিকা বটে, কিন্তু জেনারেশন গ্যাপ অতিক্রম করা তো সহজ নয়। রাখীর মনের খবর বা অ্যাটিচুড বা বাবলুর সঙ্গে কতটা ইনভলভমেন্ট তাও তো তুমি জানো না।

ওটা ঠিক কথা নয় বিশু। রাখীর সঙ্গে আমি বন্ধুর মতোই মিশি।

আমাদের মধ্যে খোলামেলা কথা হয়। ও আমাকে সব বলে।

তাহলে বাবলুর কথা বলেনি কেন?

হয়তো সময়মতো ঠিকই বলত।

মৃন্ময়ী, মায়েরা ওরকমই ভেবে নেয় ছেলে-মেয়েদের। আর এটাই ভুল করে।

তুমি কি রাখীকে দেখতে গিয়েছিলে?

না। ইন ফ্যাক্ট, অফিস থেকে বেরিয়ে নার্সিং হোম হয়ে বাড়ি ফিরব বলে বেরোতে। যাচ্ছিলাম, ঠিক এ সময়ে তোমার ফোন এল।

রাখী মাঝে মাঝে আমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করে।

কী কথা?

জিজ্ঞেস করে কার সঙ্গে ওর মুখের আদল বেশি মেলে। মা না বাবা।

তুমি কী জবাব দাও?

কী বলার আছে বলো। যার সঙ্গে ওর মুখের আদলের আশ্চর্য মিল তার কথা তো ওকে বলতে পারি না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিশ্বদেব বলে, সেটাই দুশ্চিন্তার কারণ মৃন্ময়ী। কখনো কি মিলটা রাখী খুঁজে পাবে? মাস ছয়েক আগে একটা মেয়ের বার্থ সার্টিফিকেটের জন্য এসেছিল আমার কাছে। খুব যেন অবাক চোখে বারবার দেখছিল আমার মুখ। একটু অস্বস্তি হয়েছিল আমার।

বলোনি তো।

মনের ভুলও হতে পারে। মনে পাপ আছে বলেই হয়তো অস্বস্তি হচ্ছিল।

মৃন্ময়ী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কী জানি কী হবে। যাও, একবারটি মেয়েটাকে দেখে এসো।

যাচ্ছি মৃন্ময়ী। চিন্তা কোরো না। ওর চিকিৎসার ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও। দরকার হলে কলকাতা থেকে স্পেশালিস্ট আনব। রাখীকে বাঁচতেই হবে।

৫. ভিজিটিং আওয়ার্স

ভিজিটিং আওয়ার্স কেটে গেছে। রিসেপশনের বেশির ভাগ আলোই নেভানো। একটিমাত্র মেয়ে রিসেপশন সামলাচ্ছে। তার সামনে শিবদাস দাঁড়ানো, সঙ্গে আরওদু-জন উর্দিধারী লোক।

শিবদাস যে। কী ব্যাপার?

আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।

আসুন, আমার ঘরে আসুন।

নার্সিং হোমে নিজের সুন্দর করে সাজানো অফিসে নিয়ে গিয়ে শিবদাসকে বসিয়ে নিজের রিভলভিং চেয়ারে গিয়ে বসে বিশ্বদেব।

বলুন।

আজ একটা গুরুতর কথা বলতে আসা।

বলুন না।

রিগার্ডিং বাবলু।

বাবলুকে নিয়ে আবার কী হল?

আপনি কি জানেন যে বাবলু ওয়াজ ইন লাভ উইথ রাখী?

ভ্রূ কুঁচকে বিরক্তির সঙ্গে বিশ্বদেব বলে, হ্যাঁ, এরকম একটা উড়ো খবর শুনেছি।

উড়ো খবর নয়। বাবলুর বন্ধুরা কবুল করেছে যে, ব্যাপারটা সত্যি।

এরকম হওয়া বিচিত্র নয়। তবে ডিসগাস্টিং।

কথাটা হল, মার্ডার বা সুইসাইড বা যেকোনো চেষ্টা হয়ে থাকলে আমাদের একটা নিয়মমাফিক এনকোয়ারি করতেই হবে। সে ক্ষেত্রে লাভ অ্যাঙ্গেল বাদ যাবে না।

মেয়েটা সেরে উঠবে শিবদাস, ডাক্তাররা সেরকমই ভরসা দিচ্ছে। জ্ঞান ফিরলে ওকে জিজ্ঞেস করে দেখলে হবে।

তবু কথাটা আপনাকে জানিয়ে রাখছি। পাবলিসিটি হয়তো পুরোটা এড়ানো যাবে না। বাবুলকে আমি একটু সাবধান করে দিয়েছি।

বাবলু কলকাতায় থাকে, এ ব্যাপারে তার দায় কতটা তা ভেবে দেখার ব্যাপার।

ইদানিং নাকি মেয়েটা বাবলুকে অ্যাভয়েড করছিল। বাবলু তাতে খুবই অ্যাজিটেটেড। ও মেয়েটাকে ছাড়তে চায় না। আমি ওকে বলেছি মেয়েটা যখন চাইছে না তখন ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা না করাই ভালো। আপনিও বাবা হিসেবে ওকে কথাটা বুঝিয়ে দেবেন।

ঠিক আছে। আর কিছু?

হ্যাঁ, রিগার্ডিং সিকিউরিটি।

সিকিউরিটি!

হ্যাঁ। মৃন্ময়ী বলছেন এটা অ্যাটেম্পট অভ মার্ডার। যদি তাই হয়, তাহলে রাখী হয়তো আততায়ীকে চেনে। সে ক্ষেত্রে যদি রাখী সারভাইভ করে, তাহলে আততায়ীর বিপদ। তাই আততায়ী রাখীকে আর একবার মার্ডার করার চেষ্টা করবে না কে বলতে পারে।

মাই গড, আমি তো এ-দিকটা ভাবিনি।

ভাববেন কেন? এসব ভাবনা পুলিশের জন্য। আর আপনার নার্সিং হোমে পুলিশ মোতায়েন করার সুবিধে নেই। বড্ড ইজি অ্যাকসেস। হাসপাতালে একটা আইসোলেশনে হাই সিকিউরিটি ওয়ার্ড আছে। এখানে তো জানালায় গ্রিল অবধি নেই।

তা ঠিক, কিন্তু ট্রিটমেন্টটা এখানে বেটার হবে। যদি বলেন তো আমি চব্বিশ ঘন্টা নজরদারির ব্যবস্থা করতে পারি।

রিস্ক তবু থাকবেই। ডাক্তারেরা অবশ্য রিমুভ করতে বারণ করছে। পয়জনিংয়ের ফলে নাকি হার্টটা খুব উইক। সামান্য শকে ফ্যাটালিটি ঘটতে পারে।

হ্যাঁ। কেসটা এখনও পুরো কন্ট্রোলে নেই।

শিবদাস বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পর বিশ্বদেব রাখীর কেবিনে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে রাখীর দিকে চেয়ে রইল। চোখে একটু জল চিকচিক করছে।

একজন ডাক্তার এবং নার্স পিউ মজুমদার ঘরে ঢুকলে বিশ্বদেব অশস্তি বোধ করে।

ডাক্তার তাকে দেখে হেসে বলে, গুড মর্নিং স্যার। কেমন আছেন?

আপনিই তো একে দেখছেন।

হ্যাঁ।

কেমন মনে হচ্ছে?

বেঁচে যাবে বলেই তো মনে হয়।

সেটা কতদিনে বোঝা যাবে?

বলা মুশকিল। কোমাটা না কাটলে অ্যাসুয়েরেন্স দেওয়া যাচ্ছে না। হার্টটা নিয়েই প্রবলেম। কিডনি বেশ খানিকটা ড্যামেজড। তবে শি ইজ অ্যাপারেন্টলি ইমপ্রুভিং।

কোনো কথাটথা কি বলেছে?

না। কথা বলার মতো সিচুয়েশন আসেনি।

সারভাইভ্যাল চান্স কতটা?

ফিফটি টু সিক্সটি পারসেন্ট।

ডাক্তার চলে যাওয়ার পর পিউ বলল, একটা কথা বলব স্যার?

বলো।

রাগ করবেন না। রাখী বেশ ভালো মেয়ে।

আমি জানি।

বাবলু ওকে ভালোবাসে।

বিশ্বদেব হঠাৎ হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বলে, ওসব ভালোবাসাসির কথা আর বোলো না। আজকাল পাঁচ বছর প্রেম করার পর যে বিয়ে হয় তা পাঁচমাস টিকছে না। অল বোগাস।

কিন্তু

বিশ্বদেব হাত তুলে পিউকে থামিয়ে ভ্রু কুঁচকে বিরক্তির সঙ্গে বলল, আজকাল এত ভালোবাসার কথা শুনি যে আমার অ্যালার্জি হওয়ার জোগাড়। মেয়েটা এখনও সিরিয়াস কণ্ডিশনে পড়ে আছে, এটা কি ওসব কথা বলার সময়? তোমার কান্ডজ্ঞান কবে হবে?

পিউ থতমত খেয়ে বলে, সরি স্যার। বাবলু খুব ভেঙে পড়েছে দেখে বলে ফেলেছি।

আমি জানি, বাবলুর প্রতি তোমার একটা দিদিসুলভ টান আছে। ওকে বরং বুঝিয়ে বোলো, এখন এসব রোমান্টিক চিন্তা ঝেড়ে ফেলে ক্যারিয়ারে মন দিক। কিছুদিনের মধ্যেই বিদেশে যাবে, সেখানে বিস্তর পড়াশুনো করতে হবে। অন্য দিকে মন পড়ে থাকলে কী করে দাঁড়াবে? হৃদয়দৌর্বল্য কোনো কাজের জিনিস নয়, জঞ্জালবিশেষ। মানুষের বারোটা বাজায়, তার বিনিময়ে দেয় না কিছুই।

ঠিক আছে স্যার, আমি বাবলুকে বোঝানোর চেষ্টা করব।

বাড়িতে ফিরে বিশ্বদেব কিছুক্ষণ বাইরের খোলা অন্ধকার বারান্দায় চুপচাপ বসে রইল। পরিস্থিতি কি একটু ঘোরালো হয়ে উঠছে? কর্মফল বলে কিছু একটা আছে, যার ফল এখন নানাভাবে ফলছে! বিচক্ষণ বিশ্বদেব কখনো তাকে আর মৃন্ময়ীকে নিয়ে রসালো গুজব সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ দেয়নি। তাদের নিয়ে কোনো গুঞ্জন ওঠেনি এ শহরে। এতটাই সাবধান ছিল বিশ্বদেব। কিন্তু মেয়েটার মুখে তার অবিকল প্রতিকৃতি ফুটে উঠেছে। লোকে মিলিয়ে দেখলে অবাক হবে। তারপর রাখীর হঠাৎ আত্মহত্যার এই চেষ্টা কি কোনোভাবে সেই অতীতকে আরও উন্মোচিত করে দেবে? এবং সেই সঙ্গে বিস্মৃতপ্রায় অতীত থেকে অলোকের হাত ধরে রমেন ভট্টাচার্যের পুনরাবির্ভাব কোন সংকেত দিচ্ছে? ঘটনাবলির যে প্যাটার্ন অবলোকন করছে বিশ্বদেব তাতে মনে হয়, রাশ তার হাতে নেই। নিয়তিনির্দিষ্টভাবেই একটা নাটকীয়তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কি তার জীবন?

গেটের বাইরে একটা মোটরবাইক এসে থামল। তারপর ফটক খুলে লম্বাপানা একটি যুবক সবল পায়ে এগিয়ে এল বারান্দার দিকে। অলোক! আশ্চর্য, বিশ্বদেব ভুলেই গিয়েছিল যে, তার বাড়িতে আজ অলোকের ডিনারের নেমন্তন্ন।

বারান্দার আলোটা জ্বেলে দিয়ে বিশ্বদেব একটা উচ্চাঙ্গের হাসিতে তার উদ্বিগ্ন মুখের ছবি ঢাকা দিয়ে বলল, আরে এসো, এসো। তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।

অলোক একটা বেতের সোফায় বসে বলল, আমি এমন কিছু ইম্পর্ট্যান্ট লোক নই যে, আমার জন্য আপনি বারান্দায় বসে অপেক্ষা করবেন।

বারান্দাটা আমার খুব প্রিয় জায়গা। এখান থেকে বাগনটা দেখা যায়। সারাদিন মানুষ চরিয়ে এসে একটু নির্জনে বসতে ইচ্ছে করে।

হ্যাঁ, আপনি যা ব্যস্ত মানুষ।

আজকাল ভাবি এত কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে না পড়লেও পারতাম। পৌরসভা, ব্যবসা, নার্সিং হোম, সভাসমিতি। এখন বোরিং লাগে। তোমার মতো একটা কাজ নিয়ে থাকতে পারলে ভালো হত। পৃথিবী নিয়ে আর কতজন ভাবে বল। আমার ভাবনার দৌড় বড়োজোর এই শহরটা।

এ শহরটা নিয়েও তো কাউকে ভাবতে হবে। সবাই পৃথিবীর সংকট নিয়ে ভাবতে গেলে তো চলবে না।

সেও ঠিক কথা। তোমার কাজের কতদূর?

কাজ! সে তো অনন্ত। কাজের কোনো শেষ নেই।

তোমার সার্ভে শেষ হয়েছে?

প্রফেশনাল সার্ভেয়াররা কাজে নেমেছেন। পাহাড় জঙ্গল ঘুরে সার্ভে এবং ম্যাপিং বেশ। কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আর ম্যানপাওয়ারও দরকার। আমরা গ্রামবাসীদের কিছু কাজে লাগিয়েছি। হঠাৎ রোজগারের সুযোগ পেয়ে তারা খুব খুশি।

আর উগ্রপন্থীরা?

আমরা তাদের অ্যাডভাইজার হিসেবে রাখছি। পার্টি ফাণ্ডে চাঁদাও দেওয়া হয়েছে। তারাও আপত্তি করছে না।

তোমার কিন্তু দুর্জয় সাহস।

না না। এসব হ্যাজার্ড সর্বত্র আছে। আমরা নেগোশিয়েট করতে শিখেছি। আমাদের তো পলিটিক্যাল অবলিগেশন নেই। সেই দিক দিয়ে গ্লোবাল ফ্রেণ্ড কারা শত্রু নয়।

আমি ইন্টারনেট থেকে তোমাদের কোম্পানির কথা জেনেছি।

ভালো করেছেন।

তোমার সম্পর্কেও খোঁজ নিয়েছি।

অলোক হেসে বলল, বেশ করেছেন। নেওয়াই উচিত।

তুমি আমেরিকায় থাক, বলনি তো?

বলার মতো কিছু নয়। কাজের জন্য থাকতে হয়।

বিয়ে করেছ?

না, আমি বিয়ে করলে বউ পালিয়ে যাবে। কারণ তার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ এতই কম হবে যে, বাড়ি ফিরলে সে আমাকে হয়তো প্রথমে চিনতেই পারবে না। আমার মায়ের বয়স এখন বাষট্টি। আমি কুপুত্র বলে মায়ের সঙ্গেও সম্পর্ক প্রায় ছিলই না। আমার দুই দাদা আর দিদি বাইরে থাকেন। মা তাদের কাছেও যেতে চান না। অবশেষে চন্দননগরের বাড়িটার একতলায় ভাড়াটে বসিয়ে মাকে প্রায় জোর করে সিয়াটলে নিয়ে গেছি।

একা থাকতে পারেন?

সেটাই তো প্রবলেম ছিল। বুদ্ধি খাঁটিয়ে মাকে এই বুড়ো বয়সে একটা দোকান করে দিয়েছি। গ্রসারি শপ। বাড়ি থেকে এক ব্লক দূরে। আশ্চর্যের বিষয় মা কিন্তু দোকান পেয়ে

মহা খুশি। গাড়ি লাগে না, সকালে ব্রেকফাস্ট করে দোকানে গিয়ে বসেন। খদ্দের সামলান, এবং ব্যাপারটা এনজয় করেন। আমিও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি।

বিশ্বদেব হেসে বলল, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে।

প্র্যাকটিক্যাল বলতে পারেন।

চা খাবে?

আমার কিন্তু চায়ের নেশা নেই।

ড্রিংক কর?

না।

তাহলে শুধু কাজের নেশা?

আমার কাজটা ইন্টারেস্টিং।

এখানে তোমার থাকা খাওয়ার অসুবিধে হচ্ছে না তো?

অসুবিধে যেটা হয় তার কারণ আমি ভেজিটেরিয়ান।

সে কী? আগে বলনি কেন? আজ তো বোধহয় আমাদের বাড়িতে মাংস আর মাছের আইটেমই হয়েছে।

নো প্রবলেম। আমি ডাল ভীষণ ভালোবাসি। ডাল ভাতই যথেষ্ট।

দূর পাগল! দাঁড়াও ভিতরে গিয়ে খবর দিয়ে আসি।

আমি সিম্পল খাওয়াই পছন্দ করি। একটু অসুবিধে হয় ট্রাইবাল এরিয়ায়।

তুমি ভেজিটেরিয়ান কেন?

বাই চয়েস। আমার পশু-পাখি খেতে ইচ্ছে করে না।

এ নোবল কজ!

বলতে পারেন। তবে অনিচ্ছেটা জেনুইন।

দাঁড়াও বাপু, গিন্নিকে বলে আসি। নইলে ডিনার টেবিলে উনি লজ্জায় পড়বেন।

কিন্তু কথাটা বলতে গিয়ে বিশ্বদেবকে আহাম্মক বনতে হল। শর্মিলা মৃদু হেসে বলল, উনি যে ভেজিটেরিয়ান সে তো আমরা জানি।

জানো! কী করে জানো?

শর্মিলা হেসে কুটিপাটি হয়ে বলল, স্বস্তি খবর এনেছে।

আহা, স্বস্তিই বা জানবে কী করে?

রুচিরা গম্ভীর হয়ে বলে, কেউ ওকে বলেছে হয়তো। তুমি ব্যস্ত হোয়ো না, তোমার অতিথির সম্মানে আজ আমাদের পুরো ভেজিটেরিয়ান ডিনারই হচ্ছে। আর তাতে আমাদের তেওয়ারি ভীষণ খুশি।

যাক, একটা দুশ্চিন্তা গেল।

ফের বরান্দায় ফিরে এসে বিশ্বদেব দেখল, অলোক নিঝুম হয়ে বসে আছে।

কী ভাবছ?

কিছুই না।

বোধহয় গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর কথা!

সেটা ভাবতে হয় না, সর্বদাই মনে একটা ভয়ের মতো বাস করে। তুমি বরং একটা সফট ড্রিংক নাও। শুধু মুখে বসে থাকছ ভালো দেখাচ্ছে না।

ব্যস্ত হবেন না। অনেক জায়গায় আমাদের দিনের পর দিন খাবার জোটে না। সফট ড্রিংকস আপনারাও খাবেন না। আল্টিমেটলি ওতে চিনি ছাড়া কোনো বিভারেজই থাকে না।

জানি। তবু তো সবাই বোতল বোতল খাচ্ছে।

তা ঠিক। তবে দেশে আগে যে সোড়া বা লেমোনেড পাওয়া যেত তা অনেক ভালো ছিল।

ঠিকই বলেছ। সেই স্বাদ ভোলার নয়।

ফটক খুলে একটি মেয়ে ঢুকল।

স্বস্তি! কোথায় গিয়েছিলি?

একটি নীল চুড়িদারে স্বস্তিকে দারুণ দেখাচ্ছে। মুখে তেমন কোনো দৃশ্যমান প্রসাধন নেই, বাঁ-হাতের কবজিতে একটা পুরুষালি ঘড়ি ছাড়া কোনো আভরণও নেই। মিষ্টি গলায় বলল, নার্সিং হোমে। রাখীকে দেখে এলাম।

ও। কেমন দেখলি?

তুমি তো গিয়েছিলে আজ, পিউদি বলছিল।

হ্যাঁ

একটু একটু তাকাচ্ছে কিন্তু। মনে হয় বেঁচে যাবে, না?

বাঁচবে।

ডাক্তাররা তোমাকে বলেছে?

হ্যাঁ। বয়সের জোর তো আছে, কমপ্লিকেশন কাটিয়ে উঠবে।

কিন্তু ওকে যদি হাসপাতালে শিফট করে?

দেখা যাক। শিবদাস অবিবেচক লোক নয়। ইচ্ছে করলে ওরা নার্সিং হোমে সিপাই রাখতে পারে। আমার আপত্তি নেই। এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই আয়।

আমি ওকে চিনি। যদিও আলাপ নেই।

আলাপ কর না। ও হচ্ছে

জানি। তোমার কাছেই তো শুনেছি! রাখীর কাছেও।

অলোক মৃদু হেসে বলল, হ্যাঁ, রাখীর সঙ্গে আমার একটা চান্স মিটিং হয়ে যায়, তারপর উই বিকেম ফ্রেণ্ডস।

রাখী আপনার কথা আমাদের কাছে বলেছে। আপনি নাকি খুব মিশুক মানুষ।

তা বলতে পারেন। সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করারই চেষ্টা করি। আমরা যে গ্লোবাল ফ্রেণ্ডস।

আপনি রাখীর বন্ধু, রাখী কেন সুইসাইড করার চেষ্টা করল তা জানেন?

সেটা তো আমার জানার কথা নয়।

আন্দাজ করতে পারেন না?

না। উই আর নট দ্যাট ক্লোজ।

রাখী কিন্তু অন্য কথা বলে।

স্বস্তির গলা উপরে চড়ছে দেখে বিশ্বদেব অস্বস্তি বোধ করে বলে, ও কী স্বস্তি? তুমি কি রাখীর কারণে একে চার্জ করছ নাকি? ভুলে যেও না, অলোক আজ আমাদের অতিথি।

স্বস্তি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, সরি বাবা। আই অ্যাপোলোজাইজ। যাচ্ছি।

বলে স্বস্তি এক ঝটকায় পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল।

বিশ্বদেব বলল, কিছু মনে কোরো না অলোক। আমার ছোটো মেয়ে একটু মুডি।

না। মনে করার কী আছে। উনি হয়তো আর কিছু ভেবে নিয়েছেন। রাখী ভালো মেয়ে।

খুব তেজিও। জানো বোধহয়!

রাখীর সঙ্গে আমার পরিচয় খুব বেশিদিনের নয়। পাহাড়ে একদল মেয়ে পিকনিক করতে গিয়েছিল, আমি তখন তাঁবুতে থাকতাম। সেই সময়ে হঠাৎ আলাপ হয়। আমার মিশন জেনে উনি আমাকে অনেক প্রশ্ন করেন। খুব ইন্টেলিজেন্ট প্রশ্ন। তারপর কয়েকবার বাড়িতে চা খেতে ডাকেন। এভাবেই একটা চেনাজানা তৈরি হয়ে যায়। আপনার মেয়ে হয়তো মনে করে সম্পর্কটা তার চেয়েও গভীর কিছু।

তাহলেই বা ক্ষতি কী?

ক্ষতি আছে।

কী ক্ষতি অলোক?

আমি ঠিক ওরকম নই।

তোমাকে দেখেও আমার মনে হয়েছে তুমি লঘুচিত্ত নও। তুমি একজন ডেডিকেটেড ভলান্টিয়ার। এ কারেজিয়াস ম্যান। ইগনোর স্বস্তি, ওর কথায় কান দিও না।

ঠিক আছে। আমি কিছু মনে করিনি।

একটু বাদে খাওয়ার টেবিলে যখন দেখা হল তখন স্বস্তির মুখখানা থমথমে, তবে সে অলোককে উপেক্ষার ভাব দেখাল না। প্রথমেই বলল, জানেন তো আপনার সম্মানে আমরা সবাই আজ নিরামিষ খাব।

অলোক বিস্মিত হয়ে বলল, তা কেন? আপনারা মাছ-মাংস খেতেই পারেন।

নাঃ, আপনার একটা সম্মান আছে না?

আছে বুঝি! বলে অলোক হো হো করে হাসল।

আর লজ্জায় রাঙা হয়ে কুঁকড়ে গেল স্বস্তি।

টুলু খুব মন দিয়ে লক্ষ করছিল অলোককে। বলল, আপনি সিয়াটলে থাকেন?

ওটা আমার আস্তানা বলতে পারেন। কিন্তু থাকা আর হয় কই? কেবল ছোটাছুটি করে বেড়াতে হয়।

কোথায় কোথায় যেতে হয় আপনাকে?

যেখানে জল সেখানেই আমি। খাল, বিল, সমুদ্র, গ্লেসিয়ার, প্রাইমা ফ্রস্ট সবই আমার বিষয়।

জল নিয়ে গবেষণাটা কী ব্যাপার বুঝিয়ে বলবেন?

জলই তো ভবিষ্যতে সমস্যা হয়ে উঠবে। অতি-জল এবং জলহীনতা। ভূপৃষ্ঠ থেকে কয়েকটা দেশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ডাঙায় দেখা দেবে জলকষ্ট। আবহাওয়া যাবে পালটে, এই ওলটপালটের জন্য দায়ী গ্রিনহাউস গ্যাস। সভ্যতার বেহিসেবি অগ্রগমনের খাজনা দিতে হবে মানুষকে।

গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ব্যাপার তো!

হ্যাঁ। ঠেকাতে পারবেন?

মানুষের চৈতন্য হলে ঠেকানো যাবে।

আপনি যে দেশে থাকেন সেই আমেরিকাই তো সবচেয়ে বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস বাতাসে ছাড়ে।

হ্যাঁ। তারা কোনো নিয়ন্ত্রণ মানতে চায় না। ভোগবাদ টসকালে তারা বিগড়ে যায়।

আপনি প্রাইমা ফ্রস্টের কথা বললেন। কিন্তু সে তো শুধু পোলার রিজিয়নে পাওয়া যায় শুনেছি। তার মানে আপনি পোলার রিজিয়নেও গেছেন?

না গেলে চলবে কেন?

তার মানে গেছেন?

হ্যাঁ।

কোনটাতে?

অলোক মৃদু হেসে বলে, দুটোতেই।

এবং অনেক বার।

মাই গড!

পৃথিবীর যথার্থ অবস্থা বুঝতে গেলে দুটো পোলেই যাওয়া দরকার।

গিয়ে কী বুঝলেন?

আমি তো একা যাইনি। টিমের সঙ্গে গিয়েছিলাম। দলে অনেক বিশেষজ্ঞ ছিলেন। নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা করতে হয়েছে। আমার কাজ ছিল কিছু অ্যানালাইসিস।

তাঁবু খাঁটিয়ে থাকতে হত?

দক্ষিণমেরুতে অনেক নিষেধাজ্ঞা আছে। খুব সাবধানে চলতে ফিরতে হয়। কোনো জন্তু জানোয়ারের কাছে যাওয়া যায় না, কোনো বর্জ্য ফেলা যাবে না। এমনকী স্পিটিং-ও চলবে না। একজন মুখের চুইংগাম ফেলেছিল বলে তাকে দেড় ঘন্টা ধরে সেটা খুঁজে বের করে পকেটস্থ করতে হয়েছিল। আমরা জাহাজে থাকতাম, তবে মোটোর স্লেড-এ করে অনেকটা ভেতরে যেতে হয়েছে। তা ছাড়া আমাদের একটা স্থায়ী ক্যাম্পও ওখানে আছে। সেখানেও কিছুদিন থেকেছি। অ্যান্টার্কটিকা ইজ এ ম্যাগনিফিসেন্ট প্লেস।

আর ঠাণ্ডা?

সাংঘাতিক। ঈশ্বরের কাছে আমাদের সকলের প্রার্থনা, আর্কটিকা বা অ্যান্টার্কটিকা যেন কখনো তার শীতলতা না হারায়, বরং আরও শীতল হয়। পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য তাদের ঠাণ্ডা থাকা দরকার।

এসব আমরা কিছু কিছু জানি। আপনার কোম্পানি এর অ্যান্টিডোট হিসেবে কী করতে চায়?

শুধু আমাদের কোম্পানি কেন, পৃথিবীর বহু সায়েন্টিস্ট এবং সায়েন্টিফিক অর্গানাইজেশন কাজ করছে। কিন্তু হিউম্যান হ্যাবিটস এবং বিহেভিয়র নিয়ন্ত্রিত না হলে কিছুই হওয়ার নয়। জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে, বিশেষ করে থার্ড ওয়ার্ল্ডে হিউম্যান হ্যাঁবিট্যাট বাড়ছে, নগরায়ণ হচ্ছে, জঙ্গল সাফ করা চলছে। এমনকী ব্রাজিলের রেইন ফরেস্ট-ও রেহাই পাচ্ছে না। এর ফল ভয়াবহ। এখনও যদি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করা হয়, গাছ কাটা বন্ধ না করা যায় তাহলে পৃথিবীর সাংঘাতিক বিপদ। ম্যালথাসের থিওরি অনুযায়ী

প্রকৃতিই নির্মমভাবে লোকক্ষয় ঘটিয়ে ভারসাম্য আনবে। আমরা প্ল্যান করে জনসংখ্যা যদি না কমাতে পারি তাহলে প্রকৃতিই তা করবে, তবে সেটা ঘটবে অতি নিষ্ঠুরভাবে।

আপনি তো ভয় ধরিয়ে দিচ্ছেন মশাই!

হ্যাঁ, আমরা সাধারণ মানুষরা তো ভয় পাচ্ছিই, কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধানরা যে পাচ্ছেন না। আমেরিকা নিয়ন্ত্রণ মানতে চায় না, ইউরোপ মানতে চায় না, পশ্চিম এশিয়া মানতে চায় না। এই পশ্চিমবঙ্গেই তো ইণ্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এখন যত ইণ্ডাস্ট্রি তৈরি হবে ততই জমি, তৃণভূমি, জঙ্গল লোপাট হবে, ততই ক্ষতি হবে পৃথিবীর।

আপনি জল নিয়ে কাজ করেন শুনেছি।

হ্যাঁ, জল আমাদের বন্ধু, আবার শত্রুও।

আপনি কি সায়েন্টিস্ট?

মৃদু একটু হেসে অলোক বলল, সায়েন্টিস্ট বললে বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। যেটুকু সায়েন্স জানলে চাকরিটা বজায় রাখা যায় সেটুকু জানি। আমরা উদ্বাস্তু, গরিব, বাবা আমাকে যথাসাধ্য লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যতটা সচ্ছলতার প্রয়োজন ছিল, তা তো আমাদের ছিল না। ফলে লেখাপড়া বারবার বাধা পেয়েছে।

গ্লোবাল ফ্রেণ্ড ইনকরপোরেটেড কি খুব বড়ো কনসার্ন?

হ্যাঁ। বিগ কনসার্ন।

টেকনিক্যাল লোক না হয়েও আপনি এখানে চাকরি পেলেন কীভাবে?

সে একটা মজার গল্প।

মজার গল্প? মজার গল্প শুনতে আমরা সবাই ভালোবাসি।

বিশ্বদেব এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার সেও বলল, হ্যাঁ, মজার গল্পটা শুনিয়ে দাও।

অলোক বলল, রসায়নে এম.এস.সি. পাশ করে আমি একটা ছোটো মফস্সল শহরের কলেজে অধ্যাপনা করতাম। কিন্তু অধ্যাপনা মানেই সিলেবাসে আটকে যাওয়া। বিশ্বের বিজ্ঞানে রোজ নতুন নতুন থিয়োরি আসছে, পুরনো সংজ্ঞা পালটে যাচ্ছে, কত কী আবিস্কার হচ্ছে। অধ্যাপনার জালে আটকে গিয়ে আর সেসবের খবরই রাখা হচ্ছিল না। তবে পাগলামিবশত আমি বিদেশি জারনালে আমার নানা ভাবনাচিন্তার কথা লিখে পাঠাতাম। বেশির ভাগই ছাপা হত না। তবে একটা-দুটো বেরিয়েও যেত। গ্লোবাল ফ্রেণ্ডেরও বেশ কয়েকটি পত্রিকা বেরোয় আমেরিকায়। আমি তাদের পত্রিকাতেও লেখা পাঠাই। রিসার্চ গ্রুপের এক কর্তা হঠাৎ আমাকে একটা চিঠি লিখে জানালেন যে, তিনি কলকাতায় আসছেন, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করলে খুশি হবেন। আমি গিয়েছিলাম। দেখলাম, ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ, প্রাণশক্তিতে ভরপুর মানুষ। আমার সঙ্গে ঘণ্টাখানেক গল্প করলেন। তার মধ্যে তিনি বারবার আমার ভাবনাচিন্তা সম্পর্কে প্রশ্ন করছিলেন। আমি তখনও বুঝতে পারিনি যে, উনি আসলে আমার ইন্টারভিউ নিচ্ছেন। শেষে আমাকে বললেন, আমাদের কোম্পানি কিছু পাগলকে রিক্রুট করতে চায়, যেসব পাগলের চিন্তার ধারা কোনো পূর্বসিদ্ধান্তের দ্বারা শৃঙ্খলিত নয়। মনে আছে তিনি ওয়াইল্ড থিংকার শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন।

তারপরই চাকরি?

প্রায় বারো মাস বাদে আমাকে চাকরি দেওয়া হয়।

কোথায় জয়েন করলেন?

সিয়াটলে।

সেখানেই সেটল করবেন?

জানি না। তবে থাকা তো আর হয় না। যেখানে যেখানে কোম্পানি কাজ পায়, সেখানেই ছুটতে হয়।

আর আপনার মা? তিনি কোথায় থাকবেন?

মায়ের কথা আর কী বলব। আমি কুপুত্র, তাই এই বুড়োবয়সে, যখন আমাকে তাঁর সবচেয়ে বেশি দরকার, তখন আমি তাঁর কাছে থাকতে পারি না। আর আমাকে ছাড়া মা-ও বড় অসহায় বোধ করত। সেইজন্য মাকে আমি সিয়াটলে একটা দোকান করে বসিয়ে রেখেছি। ছোটো গ্রসারি শপ এখন দেখছি, এই বাষট্টি বছর বয়সে মা দোকানটা নিয়ে দিব্যি মেতে আছেন। দোকান থেকে এক ব্লক দুরে আমাদের বাড়ি। কাজেই গাড়ি চালাতে না জানলেও মা-র অসুবিধে হয় না।

আপনি গ্রিনকার্ড হোল্ডার না সিটিজেন?

গ্রিনকার্ড। সিটিজেন হওয়ার ইচ্ছে নেই।

ফিরে আসার ইচ্ছে আছে তাহলে?

যাওয়া বা ফেরার কথা ভাবি না। আমি তো সারা দুনিয়ায় দৌড়ে বেড়াচ্ছি। যাওয়া বা ফেরা কোনোটাই বুঝতে পারি না। আর এই ছোটাছুটি করতে করতে কোনো বিশেষ দেশ নয়, পৃথিবীটাকেই আমার বড় ভালো লাগে। গোটা পৃথিবীটাই যেন আমার দেশ।

বিশ্বদেব বলল, দ্যাটস এ নোবেল থট। আসলে পৃথিবীটাই তো আমাদের দেশ হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা ছোটো করে ভাবি বলে যত গন্ডগোল।

হঠাৎ টুলুর দিকে চেয়ে অলোক বলল, আপনার রুগির কী খবর?

রুগি! কে রুগি বলুন তো!

আমি রাখীর কথা জিজ্ঞেস করছি।

রাখী ঠিক আমার আণ্ডারে নেই। মেডিসিনের লোকদের আণ্ডারে আছে। তবে অপারেশনের দরকার হলে অন্য কথা। কেন, আপনি কি রাখীকে চেনেন নাকি?

ঠিক সে-রকম চেনা নয়। উনি একটা দলের সঙ্গে পিকনিক করতে জঙ্গলে গিয়েছিলেন। আমরা তখন সেখানে তাঁবু মেলে কাজ করছিলাম। উনি কৌতূহলী হয়ে এসে আলাপ করেন।

শুধু আলাপ?

হ্যাঁ। উনি আমাদের মোড অফ অপারেশনস জানতে চেয়েছিলেন।

এটা কবেকার ঘটনা?

মাস খানেক আগে। তখনই মনে হয়েছিল কোনো কারণে উনি খুব আপসেট। বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন।

টুলু অবাক হয়ে বলল, কেন আপসেট তা বলেছিল?

নট ইন সো মাচ ওয়ার্ডস। সদ্য চেনা কাউকে বলবেই বা কেন? আমিও ভদ্রতাবশে কৌতূহল দেখাইনি। শুধু বলেছিলাম, ওয়াচ ইওর স্টেপস। আপনি খুব আনমাইণ্ডফুল আছেন। উনি বলেছিলেন, হ্যাঁ, সেটা ঠিক কথা।

আর কিছু নয়?

না। শুধু বলেছিলেন, একজন লোক ওর জীবনটাকে নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কারো নাম বলেননি।

মাই গড! এসব তো আমরা জানতাম না।

.

খাওয়ার পর অলোক বিদায় নিতেই স্বস্তি ঘোষণা করল, লোকটা চালিয়াৎ, মোটেই সত্যি কথা বলেনি।

শর্মিলা অবাক হয়ে বলে, কী করে বুঝলি?

কেমন ক্যাবলা টাইপের দেখলে না! গুলগল্প ঝেড়ে গেল। পোশাক দেখলেই তো বোঝা যায়, একদম গোবরগণেশ। খোঁজ নিয়ে দেখো, মোটেই সিয়াটলে থাকে না।

বিশ্বদেব খুব শান্ত গলায় বলল, খোঁজ আমার নেওয়া হয়ে গেছে। আমি আজ সকাল দশটায় এদের দিল্লি অফিসে ই-মেইল করে অলোকের পজিশন জানতে চাই। তারা যে-জবাব পাঠিয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, অলোক সিয়াটলে থাকে। গ্লোবাল ফ্রেণ্ডের রিসার্চ গ্রুপের সিনিয়র সায়েন্টিস্ট। আমেরিকায় ডক্টরেট করেছে।

স্বস্তি একটু লাল হয়ে বলল, তাহলেই-বা কী? মোটেই ভালো লোক নয়। কেমন যেন দেমাকি।

শর্মিলা হেসে ফেলে বলল, স্বস্তি, সত্যি করে বলো তো, ছেলেটাকে তোমার পছন্দ হয়ে যায়নি তো!

যাঃ, কী যে বল বউদি!

বলেই স্বস্তি পালিয়ে গেল।

বিশ্বদেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ছেলেটা মন্দ নয়। বুঝলে রুচিরা, স্বস্তির জন্য ভাবছিলাম। কিন্তু এ-ছেলে তো সংসারধর্মই করতে পারবে না। সারাবছর বাইরে বাইরে থাকলে সংসার করবে কখন?

তা হোক? আমার অপছন্দ নয়।

শর্মিলা বলল, আমারও খুব পছন্দ বাবা।

টুলু ভ্রূ কুঁচকে কী ভাবছিল। বলল, আমি ভাবছি অন্য কথা।

বিশ্বদেব বলল, কী কথা?

রাখীর সঙ্গে ছোকরা আবার ঝুলে পড়েনি তো? রাখীর সুইসাইডের অ্যাটেম্পটে এ ছোকরারও অবদান থাকতে পারে। এ হয়তো রিফিউজ করেছে।

শর্মিলা অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে বলে, হতেই পারে না।

কেন পারে না?

রাখী কখনো ওর প্রেমে পড়েনি।

বলতে চাও অন্য কারো প্রেমে পড়েছে?

হ্যাঁ।

সে কে?

সেটা বলা যাবে না।

.

হোটেলের ঘর। রমেন ভট্টাচার্য আর মৃন্ময়ী।

রমেন বলল, মৃন্ময়ী, আমি তোমাকে ব্ল্যাকমেল করতে আসিনি। এসেছি অফিসের কাজে। যদি প্রজেক্টটা হয়, তবে হয়তো আগামী দু-তিন বছর আমাকে এখানে ঘন ঘন আসতে

হবে এবং বেশ অনেকদিন করে থাকতে হবে। সেটা কথা নয়। আসল কথা আমি সব জেনে এবং বুঝেও তোমার সঙ্গে একটা আপসরফায় আসতে চাই। তুমি ভেবে দেখো।

কীরকম আপসরফা চাও তুমি?

রিকনসিলিয়েশন।

সেটা কি সম্ভব! এতদিন পরে?

সেটাই তো ভেবে দেখতে বলছি তোমাকে।

আর রাখী?

রাখী আমার সন্তান নয় জানি। কিন্তু ওর প্রতি মায়া আছে।

আছে?

হ্যাঁ। ওর দু-তিন বছর বয়স পর্যন্ত নিজের মেয়ে মনে করে ওকে ভালোবেসেছিলাম। কিন্তু বড়ো হওয়ার পর দেখলাম ওর মুখে আমার বা তোমার আদল নেই। তৃতীয় ব্যক্তির আদল। সেই ব্যক্তি বিশ্বদেব। তখনই আমি ডিভোর্স করি।

সব মনে আছে।

অভিযোগ তুমিও অস্বীকার করনি।

কেন করব? আজকাল ডি.এন.এ. টেস্টে সত্য গোপন থাকে না।

ঠিক কথা। কিন্তু এতগুলো বছর কেটে যাওয়ার পর ভেবে দেখলাম দুনিয়ায় একা বাঁচা যায় না। আমার তো কেউ নেই। তুমি-আমি দু-জনেই অনেক বদলে গেছি।

আমাকে কি তোমার আর বিশ্বাস হবে?

বললাম তো, এ-বয়সে মানুষের দায়বদ্ধতা এসে যায়। ভেবে দেখো।

বিয়ে করনি কেন?

ভয়ে। নতুন মানুষ এনে ফের যদি বিপাকে পড়ি?

নারীহীন জীবন?

তা বলতে পারি না। ওসব কথা থাক। আমি সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

আমি ভাবব, মেয়েটার জন্যে উদ্বেগে আমার মাথার ঠিক নেই।

জানি, মেয়েটা কি আমার কথা বলত?

খুব। তারপর ধীরে ধীরে অ্যাডজাস্ট করে নিল। তুমি কি ওকে নিজের মেয়ের মতো ভাবতে পারবে?

নিজের মেয়ে তো নেই, তাই সেটা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু ওই তো বললাম, ওকে অ্যাকসেপ্ট করতে অসুবিধে হবে না।

.

সকালে বিশ্বদেব যখন বারান্দায় বসে খবরের কাগজ দেখছে, তখন রুচিরা এল, পরনে হাউসকোট।

তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

বলো।

ওই অলোক ছেলেটিকে তোমার কেমন লাগে?

ভারি ভালো।

কত মাইনে পায় জান?

হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

স্বস্তির জন্যে ভাবছি।

আরে স্বস্তি তো এখনও নাবালিকা।

তোমার নাবালিকা মেয়ের বয়স আঠারো পেরিয়েছে।

তাতে কী? বিয়ের কথা ভাববার বয়স তো নয়।

শোনো, স্বস্তি লেখাপড়ায় তেমন ভালো নয়, মন নেই। আমার মনে হয় ও বেসিক্যালি হাউসওয়াইফ টাইপ। ঘর-সংসার করার আগ্রহ বেশি।

স্বস্তি কি ওর প্রতি ইন্টারেস্টেড?

অ্যাপারেন্টলি না। বরং উলটোই।

কীরকম?

বউমাকে বলেছে, ছেলেটাকে ওর নাকি একটুও ভালো লাগে না। কেমন জংলি টাইপ, বোকা-বোকা, আনমনা, এইসব।

তাতে বোঝা গেল ওর পছন্দ নয়।

আবার উলটো বুঝলে। ওসব বলা মানেই ও ইন্টারেস্টেড। একটু বেশিই ইন্টারেস্টেড, সেটা ঢাকা দিতেই ওসব বলছে।

উঃ বাপ রে! এ তো দেখছি সাংঘাতিক ভুলভুলাইয়া!

এবার বলো, অলোক কত মাইনে পায়?

মাইনে তোমার মনোমতো না হলে কি পাত্র খারিজ?

না, তা নয়। ওকে আমার ভারি ভালো লেগেছে।

তাহলে মাইনে-ফাইনে গুলি মেরে বিয়ে লাগিয়ে দিলেই তো হয়। পুরুষমানুষ যেমন করেই হোক বউকে ঠিকই খাওয়াতে পারবে। কিন্তু কথা হল অলোকের মতটাও তো নেওয়া দরকার।

সেটার জন্যই তোমাকে লাগবে। ওর মতটা জেনে নাও।

বড্ড তাড়াহুড়ো করছ। অলোক সম্পর্কে আরও একটু খোঁজখবর নেওয়া দরকার।

তাড়াহুড়ো করব কেন? প্রস্তাবটা দিয়ে রাখলাম। এখন খোঁজখবর যা করার তুমিই করো।

টুলু আর শর্মিলা কি জানে?

খুব জানে। শর্মিলাই তো আমাকে বলল, মা, স্বস্তি কিন্তু বেহেড।

.

নার্সিং হোমে রাত্রি বেলা একা ঘরে হঠাৎ রাখীর জ্ঞান সামান্য সময়ের জন্যে ফিরে আসে। কিন্তু চোখের দৃষ্টি শূন্য, কর্তব্যরত নার্স গিয়ে ডাক্তারকে খবর দেয়। ডাক্তার আসে।

মিস ভট্টাচার্য। কেমন আছেন?

রাখী জবাব দেয় না। চেয়ে থাকে।

ডাক্তার আরও কিছু প্রশ্ন করে। আঙুল দেখিয়ে কটা আঙুল জিজ্ঞেস করে। রাখী নিরুত্তর।

কিছুক্ষণ পর রাখী ফের আচ্ছন্নতায় ডুবে যায়।

ডাক্তার চিন্তিত মুখে বলে, লস অফ মেমরি মনে হচ্ছে। নার্স, সাইকিয়াট্রিস্ট মুকুল সেনকে কল দিয়ে রাখুন।

সকালে মুকুল সেন আসে, আবার রাখীর জ্ঞান ফিরে এলে, মুকুল সেন কিছু প্রশ্ন করে। রাখী জবাব দেয় না। কিন্তু চারদিকে তাকায়। অস্থিরতা প্রকাশ করে।

মৃন্ময়ী এবং রমেন ভট্টাচার্য একসঙ্গে ঘরে ঢোকেন।

রাখী মৃন্ময়ীকে চিনতে পারে না। কিন্তু কিছুক্ষণ রমেনের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ফের আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

ডাক্তার মুকুল সেন বললেন, টেমপোরারি মেমোরি লস বলেই মনে হচ্ছে।

রমেন জিজ্ঞেস করে, চান্স অফ সারভাইভ্যাল কতটা?

মুকুল সেন বলেন, শি উইল কাম অ্যারাউণ্ড।

মেডিসিনের ডাক্তার বললেন, শি ইজ ইমপ্রুভিং, কনটিনিউয়াস ইসিজি চলছে। এখনও পর্যন্ত অ্যালার্মিং কিছু পাওয়া যায়নি। তবে হার্ট ইজ উইক।

ডাক্তাররা বেরিয়ে গেলে রমেন আর মৃন্ময়ী পরস্পরের দিকে তাকায়।

মৃন্ময়ী হঠাৎ বলে, রাখী তোমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিল কেন বলো তো!

রমেন মাথা নেড়ে বলে, জানি না, তবে দেখলাম তাকিয়ে যেন চেনার চেষ্টা করেছিল। অথচ আমি ওর কেউ নই। ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত।

বাড়ি চলো।

দাঁড়াও। সবে তো এলাম। আবার হয়তো জ্ঞান ফিরবে।

না। বাড়ি চলো। আমি একটা ডিসিশন নিয়েছি। তোমাকে বলা দরকার।

এখনই?

হ্যাঁ। আমার মন বলছে রাখীর জন্যে আর চিন্তা নেই। ও বাঁচবে। চলো, আমাদের কথাটা জরুরি।

চলো। নার্স, প্লিজ মেয়েটার ওপর নজর রাখবেন।

নার্স হেসে বলল, চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখা হচ্ছে। এটা আই.সি.ইউ., কাজেই নজর রাখাই নিয়ম। তার ওপর সাদা পোশাকের পুলিশও আছে বাইরে।

পুলিশ! পুলিশ কেন?

তা, জানি না। বোধহয় জ্ঞান ফিরলে ওকে ইন্টারোগেট করা হবে।

দু-জনে বেরিয়ে আসে।

মৃন্ময়ী বাড়িতে এসে প্রথমে রমেনের জন্য কফি করে আনে। তারপর কাছাকাছি বসে বলে, শোনো, তুমি হয়তো জানো না যে, রাখী বিশ্বদেবের ছোটো ছেলে বাবলুর প্রেমে পড়েছে।

রমেনের হাতের কফির কাপ খানিকটা চলকে যায়। সে অবাক হয়ে বলে, মাই গড! বায়োলজিক্যালি ওরা ভাই-বোন।

আমার মাথা চিন্তায়-চিন্তায় খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বদেব জানে?

হ্যাঁ। কিন্তু জেনে কী হবে? আমি ছেলেটার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছি। কিন্তু তাতে তো ঠেকানো যাবে না।

কী করতে চাও?

আমাদের এখানকার পাট তুলে দিতে হবে।

পারবে?

রাখীর জন্যে পারতেই হবে। দরকার হলে চাকরি ছেড়ে দেব। আর তোমার প্রস্তাবে রাজি। ভেবে দেখেছি। এটাই বেস্ট অলটারনেটিভ।

দাঁড়াও। আমি যে আমার কোম্পানির কাজে এখানেই পোস্টেড।

তাহলে তুমিও চাকরি ছাড়। আমাদের অন্য কোথাও চলে যেতে হবে।

তোমার ডিসিশনটা হেস্টি হয়ে যাচ্ছে। রাখী যদি যেতে না চায়?

ওর মেমরি কাজ করছে না। এখন যদি চলে যাই, তাহলে আপত্তি করতে পারবে না।

উদ্বেগে তোমার মাথা কাজ করছে না। মেমরি ফিরে এলে তখন ও মানবে কেন এই সিদ্ধান্ত।

আমি যে কিছুই ভাবতে পারছি না।

যেটা সবচেয়ে গুরুতর প্রশ্ন সেটা হল, রাখী সুইসাইড করতে চাইল কেন?

জানি না। সত্যিই জানি না। সুইসাইড বলে আমার মনে হয় না। ওকে কেউ খুন করতে চেয়েছিল।

কেন তা চাইবে?

ও তখন বাড়িতে একা ছিল। আমার মনে হয় কোনো চেনা মানুষ এসে ওকে ছাদে নিয়ে যায়। মাথায় কিছু দিয়ে মেরে অজ্ঞান করে মুখে বিষ ঢেলে দিয়ে চলে যায়।

মৃন্ময়ী, খুনের তো মোটিভ থাকবে। উদ্দেশ্যহীন খুন তো লজিক্যাল নয়।

তুমি ঠাণ্ডা মাথার লোক। তোমার কী মনে হয়?

কোনোভাবে ও হয়তো জানতে পেরেছে ওর বাবা কে।

তুমি, আমি আর বিশ্বদেব ছাড়া আর কেউ এ-কথাটা জানে না।

ঠিক বলছ?

হ্যাঁ।

রমেন মাথা নেড়ে বলে, অঙ্ক মিলছে না।

.

বিশ্বদেবের অফিসঘরে বিশ্বদেব আর অলোক মুখোমুখি।

বিশ্বদেব বলে, বাই দি ওয়ে, তুমি কি রমেন ভট্টাচার্যকে চেনো?

কেন চিনব না? উনি আমাদের বস। আগে তা এখানেই থাকতেন। ওঁর স্ত্রী এখনও–

বিশ্বদেব হাত তুলে বাধা দিয়ে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ জানি। রমেনের পজিশন কীরকম?

উনি সিনিয়র পোস্টে আছেন। ম্যানেজেরিয়াল র‍্যাঙ্ক।

শুনলাম সে এখানে এসেছে। আমার সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি। উই ওয়ার ক্লোজ ফ্রেণ্ডস। প্রজেক্ট হলে উনি এখানেই থাকবেন। ভেরি কমপিটেন্ট ম্যান।

হঠাৎ বিশ্বদেব প্রসঙ্গ পালটে বলে, শোনো অলোক, আজ রাতেও তুমি আমাদের সঙ্গেই খাবে।

আরে, তার কী দরকার? রোজ রোজ আপনার অন্ন ধ্বংস করতে যাব কেন?

তোমার মাসিমার ইচ্ছে।

উঠে দাঁড়ায় অলোক, বলে, ঠিক আছে। কিন্তু আমাকে এখন একটু সাইটগুলোতে যেতে হবে টিম নিয়ে। ফিরতে দেরি হবে।

হোক। আমরা অপেক্ষা করব।

একটু বাদেই রমেন ভট্টাচার্যকে মোটরবাইকের ক্যারিয়ারে চাপিয়ে পাহাড়ি অঞ্চলের রাস্তায় দেখা যায় অলোককে।

রমেন বলে, অলোক, প্লিজ সাবধানে চালাও। তোমার রাশড্রাইভ করার বদ অভ্যাস কেন?

অলোক তবু স্পিড কমায় না। এক জায়গায় বাইক দাঁড় করিয়ে সে তার প্ল্যান বোঝাতে থাকে।

রমেন দু-চারটি প্রশ্ন করে।

তারপর দুজনে একটা গাছতলায় বসে।

অলোক জিজ্ঞেস করে, ভট্টাচার্যদা, বউদিকে ডির্ভোস করেছিলেন কেন?

রমেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, সে অনেক কথা! সব শুনতে চেও না। মেয়েরা যখন ক্যারিয়ারকে বেশি গুরুত্ব দিতে থাকে, তখনই সংসারের ভিত আলগা হতে শুরু করে।

মৃন্ময়ী অত্যন্ত অ্যাকমপ্লিশড হেডমিস্ট্রেসবলে শুনেছি।

ঠিকই শুনেছ, তবে শি ওয়াজ নট দ্যাট অ্যাকমপ্লিশড হাউজওয়াইফ।

আপনি সেই পুরোনো মেল শোভিনিস্টের মত কথা বলছেন।

না রে ভাই, সংসার বা পরিবার যদি গুরুত্বহীন ব্যাপার হত তাহলে মানুষ চিরকাল নোম্যাডস থাকত। পরিবার তৈরি হয়েছিল গুরুতর প্রয়োজনেই।

ফের বিয়ে করলেন না কেন?

ভয় হয়েছিল, দাম্পত্য বোধহয় আমার সইবে না। আমি অচল মুদ্রা।

এখনও তাই ভাবছেন?

হ্যাঁ। তবে আমি মৃন্ময়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি।

করেছেন? সেটা আগে বলবেন তো!

মৃন্ময়ীর একটা ক্রাইসিস যাচ্ছে, জানো বোধহয়? ওর মেয়ে

অলোক অবাক হয়ে বলে, তার মানে? সে তো আপনারও মেয়ে!

কিছুক্ষণ থম ধরে বসে থেকে রমেন বলে, তোমাকে আমি খুব বিশ্বাস করি, তাই বলছি। মেয়েটি আমার নয়। কার তা জিজ্ঞেস কোরো না। কিন্তু মেয়েটাকে আমার কখনো ঘেন্না করতে ইচ্ছে হয়নি।

সরি ভট্টাচার্যদা, বোধহয় একটা সেনসিটিভ প্রসঙ্গ তুলে ফেললাম।

না যা সত্য তাকে কি আর চিরকাল চাপা দিয়ে রাখা যায়? মেয়েটা কেন সুইসাইড করতে চেয়েছিল সেটা জানা দরকার। আরেকটা কথা, মৃন্ময়ীর সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়াও হয়েছে।

সত্যি! কনগ্রাচুলেশনস।

ইট ইজ অ্যান অ্যাগ্রিমেন্ট ইন ক্রাইসিস। মৃন্ময়ীর বোধহয় এখন আমাকেই দরকার। আমারও দরকার মৃন্ময়ীকে। লাইক দ্যাট।

অন্যমনস্ক অলোক বলে, মানুষকেই তো মানুষের দরকার।

সন্ধ্যেবেলা নার্সিং হোমে রাখীর কেবিনে ঢুকল মৃন্ময়ী আর রমেন।

নার্স বলল, রাখীর আজ বিকেলে জ্ঞান ফিরেছিল।

মৃন্ময়ী : কিছু বলছিল?

হ্যাঁ, আজই প্রথম দু-একাটা কথা বলল। তবে বোঝা গেল না। শুধু দু-একবার বলল, ফোটো! ফোটো!

ফোটো! কীসের ফটো?

তা বলল না। কয়েকবার উঃ আঃ করেছিল। প্রায় দশ মিনিটের মতো জ্ঞান ছিল। তারপর ফের আগের অবস্থা।

মৃন্ময়ী রমেনের দিকে চাইল। রমেন মাথা নেড়ে জানায়, সেও ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না।

কিছুক্ষণ রাখীর পাশে বসে তারা পরস্পর কথা বলল। রাখীকে নিয়ে স্মৃতিচারণ, রাখীর ছেলেবেলার কথা।

বেরিয়ে আসার পর মৃন্ময়ী বলল, হোটেলে না-থেকে বাড়িতেই এসে থাকো না কেন? আমি যে ভরসা পাই।

সেটা কি ভালো দেখাবে মৃন্ময়ী?

খারাপই বা দেখানোর কী আছে? আমরা তো স্বামী-স্ত্রীই ছিলাম। আবার হয়তো তাই হব।

তুমি এ-শহরের মান্যগণ্য মহিলা। তোমার কোনো বদনাম হলে দুঃখের ব্যাপার হবে। স্বামী-স্ত্রী হতে গেলে লোককে জানিয়েই হওয়া ভালো।

তাই হোক, দিনের কিছুটা সময় আমার কাছে থেকো। কী জানি, কেন তুমি আসার পর আমি প্রথমে একটু ভয় পেয়েছিলাম। এখন মনে হচ্ছে তুমি আসায় বেঁচেছি। জোর পাচ্ছি।

লোকে তোমাকে প্রশ্ন করছে না আমাকে নিয়ে?

না। লোকে তো রাখীর কথা জানে, তাই আমাকে বেশি বিরক্ত করতে চায় না। স্কুল থেকে ছুটিও নিয়েছি। ফোটোর কথা কেন বলছিল বলো তো!

বুঝতে পারছি না। খুব সংকোচের সঙ্গে, একটা কথা জিজ্ঞেস করব তোমাকে?

করোই না।

খারাপ ভাবে নিও না। অদম্য কৌতূহল থেকে বলছি।

বলো। কিছু খারাপ ভাবব না।

রাখীর সঙ্গে বিশ্বদেবের মুখের আদল ভীষণভাবে মিলে যায়, তাই না?

হ্যাঁ। কিন্তু ওকথা কেন?

জানতে চাইছি, এ-ব্যাপারে কেউ কি মিলটা লক্ষ করে তোমাকে কিছু বলেনি কখনো?

না। লোকে অত লক্ষ করে না আজকাল। আর মিলটা বোধহয় এখন আর ততটা নেই। রাখী বড়ো হওয়ার পর ওর চুল বড়ো হয়েছে, ভ্রূ প্লাক করে, মেকআপ নেয়। না, এখন চট করে আদল ধরা যায় না, খুব মন দিয়ে লক্ষ না করলে।

লোকে লক্ষ না করুক, রাখী কি লক্ষ করেছে?

না। রাখী আমার বন্ধুর মতো। সব কথা বলে। লক্ষ করলে বলত।

সেটাই বাঁচোয়া।

ভোর বেলা রাখী চোখ মেলেই বাবলুকে দেখতে পেল। চমকাল না, অবাক হল না। ব্যথাতুর মুখে একটু হাসল।

কেমন আছ রাখী?

ভালো।

আমি তোমার জন্যে ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যাচ্ছি।

আমি ভালো আছি। বলেই ফের চোখ বুজল রাখী।

তোমার সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার ছিল।

রাখী চোখ খুলল না। নিস্তেজ গলায় বলল, এখন কোনো কথা শুনতে আমার ইচ্ছে করছে না। আমি একটু চুপচাপ থাকতে চাই, তুমি এখন যাও।

যাচ্ছি। কিন্তু আমার কথাও একটু ভেব। আমি যে খাদের কিনারায় পৌঁছে গেছি।

জীবনে যা কিছু ঘটে তার সব কিছুর লাগাম আমাদের হাতে নেই। অন্যের পাপ এবং তার ফল আউট আমাদের বহন করতে হয়। তুমি যাও বাবলু, কে কোন খাদের ধারে দাঁড়িয়ে আছে, তা ভাবনার কোনো আগ্রহ নেই আমার। দয়া করে চলে যাও।

একটি অল্পবয়সী নার্স ঘরে ঢুকে বাবলুকে দেখে একটু ভ্রূ কুঁচকে বলল, এটা ভিজিটিং আওয়ার নয়। আপনি কী করে ঢুকে পড়লেন।

রাখী চোখ না খুলেই একটু টেনে টেনে বলল, রুপু, উনি হলেন নার্সিং হোমের মালিকের ছেলে। ওঁর নিয়ম-কানুন মানবার দরকার হয় না। বরং আপনার চাকরি যেতে পারে।

নার্সটি থতমত খেয়ে বলল, ওঃ সরি। আমি তো আপনাকে চিনতাম না।

বাবলু গম্ভীর মুখে বেরিয়ে গেল।

রুপু গরম জলে তুলো ভিজিয়ে রাখীর মুখ স্পঞ্জ করতে করতে বলল, চোখে জল কেন?

চোখের জলের পেছনে অনেক কারণ আছে রুপু। জীবন যে কত অদ্ভুত খেলা দেখায়!

তা খুব সত্যি।

বিষ খেয়েছিলাম, কিন্তু মরলাম না। কেন কে জানে! মরাও হল না, আবার এখন লোকের বিদ্রূপের পাত্রী হয়ে বেঁচে থাকার জ্বালা সইতে হবে।

ওসব কেন ভাবছেন? আমাদের কার জীবনে দুঃখ নেই বলুন তো, তবু বেঁচে থাকার জন্য কী না করতে হয় বলুন? মরলে জ্বালা জুড়োয় হয়তো, কিন্তু জীবনের সবটাই তো আর জ্বালা-যন্ত্রণা নয়। মাঝেমধ্যে আশ্চর্য সুখ, অবাক করা অভিজ্ঞতাও তো হয়। মাস দুই আগে এক মহিলার খুব সেবা করেছিলাম। যাওয়ার সময় উনি আমাকে একছড়া সোনার হার দিলেন জোর করে। বললেন, তুমি প্রফেশনাল নার্স, কিন্তু মেয়ের মতো সেবা করেছ।

আমার নিজের ছেলে বিদেশে থাকে, কেবল টাকা পাঠিয়ে খালাস। আপনজনরা তো আপন হল না, তুমি পর হয়েও আপনজনের মতো সেবা করলে।

রাখী চুপ করে শুয়ে রইল, কথা বলল না।

সকাল আটটার পর রমেন আর মৃন্ময়ী এল। মুখে একটু খুশির ভাব।

তোকে নাকি আজ বিকেলে ছেড়ে দেবে।

জানি না।

তার মাথায় হাত রেখে মৃন্ময়ী বলে, খুশি হোসনি?

রাখী চোখ খুলে স্লান একটু হেসে বলল, খুশি হব কেন? নার্সিং হোম থেকে ছাড়া পেলেই কি মুক্তি? কত কর্মফলের বন্ধন আমাদের আটকে রেখেছে, তা থেকে মুক্তি কোথায় বল!

মৃন্ময়ীর মুখটা শুকিয়ে গেল। চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থেকে বলল, আমার দোষ, আমার অপরাধ তো স্খলন হওয়ার নয় মা। কিন্তু মানুষ তো কত প্রতিকূলতা নিয়েও বাঁচে। রমেন অবধি আজ আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ ওর সঙ্গেই তো আমি সবচেয়ে বড়ো বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম।

রাখী স্তিমিত গলায় বলে, তোমার দোষ বা অপরাধ নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না মা।

আমি শুধু ভাবি, আমার জন্ম অন্যের ইচ্ছাধীন, আমার কর্মফল অন্যের কর্মফলের পরিণতি, আমার স্বাধীন সত্তা বলে কিছু নেই। তাহলে আমরা স্বাধীনতার কথা বলি কেন? কত কত মানুষের রক্ত আমার শরীরে বল তো!

ওসব ভাবিস না মা। আমরা ঠিক করেছি, অন্য কোথাও চলে যাব। তোকে নিয়ে।

পালাবে? তা কেন মা? আমি কোথাও যাব না। এখানেই থাকব। এই শহরে জন্মেছি, বড়ো হয়েছি, এর প্রতিটি ইঞ্চি আমার চেনা। এ-জায়গা থেকে আমি পালাব কেন? যা সত্যি তার কাছ থেকে কি পালানো যায়? না সেটা উচিত?

মৃন্ময়ী আর রমেন পরস্পরের দিকে একবার তাকাল।

মৃন্ময়ী বলল, তাহলে কী করতে বলিস আমাদের?

কপালদোষে আমার দুটো বাবা, একজন জন্মদাতা, অন্যজন পালনকর্তা। জীবনটাকে নতুন ছকে, অন্য প্যাটার্নে আবার নতুন করে ভাবব মা। সে-জীবন অন্যরকম হবে, আর পাঁচজনের মতো নয়। আমি সত্যকে গোপন করব না, পালাব না, মরতে গিয়েও মরা যখন হল না, তখন নতুন আলাদা রকমের একটা জীবনযাপন করার চেষ্টা করতে হবে। তোমাকেও পালাতে দেব না, যা সত্য তা স্বীকার করে এখানেই থাকতে হবে তোমাকে, পারবে না? মৃন্ময়ী কাঁদছিল। মেয়ের মাথায় আরেকবার হাত রেখে বলল, পারব।